শাশ্বত সুখনিকেতন

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্গুরু
শ্রীলভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শাশ্বত সুখনিকেতন

অমৃতময় চিরশান্তিপূর্ণ চিন্ময়
প্রেমপূর্ণ সেবাভূমিকার সন্ধান

প্রবক্তা

পরমহংসকুলমুকুটমণি জগদ্‌গুরু
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ
বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-আচার্য্য

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ তথা শ্রীচৈতন্য-সারস্বত
কৃষ্ণানুশীলন সংঘের বর্ত্তমান সেবাইত ও সভাপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-দেবগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর
গোবিন্দ মহারাজের কৃপানির্দ্দেশে

ত্রিদন্ডিস্বামী শ্রীভক্তিপ্রপন্ন তীর্থ কর্তৃক
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
কোলেরগঞ্জ - নবদ্বীপ - নদীয়া
হইতে প্রকাশিত

প্রথম বাংলা সংস্করণ
শ্রীল গুরুমহারাজের আবির্ভাব শতবার্ষিকী উপলক্ষে
শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীশ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব বাসর
১৮ই অক্টোবর, ১৯৯৫

বাংলা অনুবাদ
শ্রীমতী দেবময়ী দাসী, কঙ্কর্ড, আমেরিকা

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া,
পিন নং ঃ ৭৪১৩০২
ফোন (০৩৪৭২) ৪০০৮৬

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৮৭ দমদম পার্ক,
কলিকাতা - ৭০০ ০৫৫
ফোন ঃ ৫৫১-৯১৭৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
বিধবাশ্রম রোড্,
গৌরবাটসাহি, পুরী, উড়িষ্যা
পিন নং ঃ ৭৫২০০১,
ফোন (০৬৭৫২) ২৩৪১৩

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালি চিড়িয়ামোড়,
উত্তর চব্বিশ পরগণা

শ্রীল শ্রীধরস্বামী সেবাশ্রম
দশবিসা, পো ঃ গোবর্ধন, মথুরা
উত্তরপ্রদেশ।
ফোন ঃ (০৫৬৫) ৮১২১৯৫।

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
১৫ নং গ্লাডিং রোড্, মেনর পার্ক
লণ্ডন। ফোনঃ (০৮১)৪৭৮২২৮৩।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সেবাশ্রম
২৯০০ নর্থ রোডিও গল্চ্ রোড্
সোকেল, ক্যালিফোর্নিয়া - ৯৫০৭৩
ফোনঃ (৪০৮) ৪৬২ - ৪৭১২

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত শ্রীধর মিশন
"শ্রীগোবিন্দধাম"
লট ২, বেলটানা ড্রাইভ, টেরানোরা
এন্. এস্. ডব্লিউ, ২৪৮৬ অষ্ট্রেলিয়া।

মুখবন্ধ

আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদ পদ্ম ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের সমগ্র বিশ্বে বিপুলভাবে সমাদৃত ও প্রচারিত ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত **"Home comfort"** পুস্তিকাটি অধুনা বঙ্গভাষায় "শাশ্বত সুখনিকেতন" নাম ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইলেন। উক্ত গ্রন্থটি বিবিধ ভাষায় প্রকাশের মাধ্যমে আমরা পূর্বে যেমন পূজনীয় বৈষ্ণবগণ তথা অনুসন্ধিৎসু সহৃদয় পাঠকগণের প্রচুর আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা ইতিপূর্বেই লাভ করিয়াছি তেমনি বর্ত্তমান প্রকাশনার মাধ্যমেও বঙ্গভাষাভাষী বন্ধুগণের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ হইতেও বঞ্চিত হইব না আশাকরি। শ্রীল গুরুমহারাজের দিব্যবাণী আজ সমগ্র বিশ্ববাসীকে যেভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে তাহাতে নতুন করিয়া তাঁহার পরিচয় বিশেষতঃ বঙ্গভাষাভাষী সজ্জনগণকে দিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। তবে আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে আমরা তাঁহারি শ্রীচরণাশ্রিতা ভক্তিমতী ও বিদুষী এই গ্রন্থটির অনুবাদিকা শ্রীযুক্তা দেবময়ী দেবী দাসীর অকুণ্ঠ সেবা-সহায়তা লাভে পরমোৎসাহিত হইয়াছি। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতে যাওয়াও বাহুল্য মনে করি। কেন না ইহা শুধু তাঁহার সেবা-ই নহে, সেবার সঙ্কল্পও।

এই গ্রন্থের ন্যায় আরও অনেক পারমার্থিক গ্রন্থ সঙ্কলনের মাধ্যমে যাঁহার নাম নিত্য স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে সেই প্রভু শ্রীমহানন্দ ভক্তিরঞ্জন এবং প্রকাশনা কার্য্যে প্রচুর সেবা-সহায়তার জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিপ্রপন্ন তীর্থ মহারাজ সকলের অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। পতিতপাবন শ্রীল গুরুমহারাজ সকলকেই আরও প্রগাঢ়ভাবে তাঁহার ভুবনমঙ্গলময় প্রচার-সেবায় নিযুক্ত করুন - ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

আমি অত্যন্ত অযোগ্য ও দীনাধম এবং শারিরীক ভাবেও ক্রমশঃই অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি। জানি না আর কতদিন তিনি কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার অভয়চরণারবিন্দের সেবায় এই মর্ত্ত্যলোকে নিযুক্ত রাখিবেন, তবে যে কোন জন্মে যেখানেই থাকিনা কেন তাঁহার শ্রীচরণসেবা হইতে যেন কখনও বঞ্চিত না হই — ইহাই তাঁহার শতবর্ষপূর্ত্তি মহামহোৎসব দিনে আমার একান্ত প্রার্থনা — কেননা "জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর"। অলমতি বিস্তরেন।

দীনাধম

শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ

শতবর্ষপূর্ত্তি শ্রীগুর্বাবির্ভাব বাসর
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ
ইং ১৮-১০-১৯৯৫

প্রথম অধ্যায়

শোষণ, ত্যাগ ও আত্মনিবেদন

আজকের এই বিষয়বস্তুটি অর্থাৎ আমি এখন যা বলতে যাচ্ছি তা খুব মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করার বিষয়। সমস্ত গতানুগতিক ধর্ম্মবিশ্বাস থেকে স্বতন্ত্র হয়ে আমরা খুব যুক্তিসম্মতভাবে এই বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

সর্ব্বপ্রথমে আমাদের বুঝতে হবে যে এই জগতে জীবনধারণের তিনটি স্তর আছে। প্রথম স্তর হল জড় বিষয় ভোগের স্তর, দ্বিতীয় স্তর হল ত্যাগের স্তর আর তৃতীয় স্তর হল ভক্তি ও আত্মনিবেদনের স্তর। সাধারণতঃ কমবেশীভাবে আমরা এই জড়ভোগের স্তরেই বর্ত্তমানে আছি। জড়ভোগের অর্থই হল অপরকে শোষণ করা। অপরকে শোষণ না করে কেউ এই স্তরে বেঁচে থাকতে পারে না।

অহস্তানি সহস্তানাং
অপদানি চতুষ্পদাম্।
লঘূনি তত্র মহতাং
জীবো জীবস্য জীবনম্।

অর্থাৎ যাদের হাত আছে তারা যাদের হাত নেই তাদের শোষণ করে বেঁচে থাকে। চতুষ্পদ জীব যাদের হাত পা নেই তাদের অর্থাৎ গাছপালা, ঘাস, লতাপাতা খেয়ে বেঁচে থাকে। বৃহৎ জীব ক্ষুদ্র জীবকে আত্মসাৎ করে। সকল জীবই অন্য জীবের দ্বারা জীবনধারণ করে।

গাছপালা ঘাস লতাপাতারও জীবন আছে। কিন্তু কেউই অপরকে শোষণ না করে এখানে বেঁচে থাকতে পারে না। সনাতন ধর্ম্ম থেকে আমরা জানি যে প্রত্যেক কর্ম্মের একটা প্রতিক্রিয়া বা কর্ম্মফল আছে। সুতরাং এই শোষণেরও একটা প্রতিক্রিয়া আছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক

নিউটনও তার "থার্ড্ ল" বা 'তৃতীয় নিয়মে' বলেছেন প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। এই শোষণের প্রতিক্রিয়া হল এই যে অপরকে শোষণ করে আমরা ঋণগ্রস্ত হই আর সেই ঋণ শোধ করতে গিয়ে আমাদের অধোগতি হয়। এইভাবে এই শোষণের স্তরে যে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সৃষ্টি হচ্ছে তার ফলে বহু জীবাত্মা আত্মবিবর্ত্তনের পথে ক্রমাগত উঠছে ও নামছে। সমগ্র জীবজগৎ, সমগ্র সমাজ এক চরম শোষণের প্রচেষ্টায় আছে। অপরকে শোষণ করে, অপরকে কষ্ট দিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা এখানে সর্ব্বত্রই দেখা যায়। এই শোষণ ছাড়া এই স্তরে বেঁচে থাকাই অসম্ভব, কারণ এ হল শোষণেরই জগৎ বা স্তর।

অনেকেই এই শোষণের স্তর থেকে বেরিয়ে গিয়ে এমন একটা পথে যেতে চান যেখানে তাঁরা এই শোষণের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেতে পারেন। বৌদ্ধরা, জৈনরা ও শঙ্করাচার্য্যের অনুগামীরা এবং আরও অনেকেই এই শোষণের স্তর থেকে বেরিয়ে গিয়ে এমন একটা জীবনযাত্রা অবলম্বন করতে চান যেখানে এইরকমের শোষণ, এইরকমের কর্ম্ম ও তার কর্ম্মফল থাকবে না। এই কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের জাল এড়াবার জন্যে তাঁরা এমন একটা ত্যাগের জীবন খোঁজেন, যে জীবনযাত্রা বলতে গেলে একরকম সমাধি বা স্বপ্নহীন নিদ্রার মত; এই জড়জগৎ থেকে নিজেকে সম্পুর্ণ গুটিয়ে নিয়ে একেবারে আত্মস্থ হয়ে থাকা। নিজেদের অনুভূতিকে এই নিম্নস্তরের জগতে আসতে না দিয়ে তাঁরা সেই আত্ম-কেন্দ্রিক জগতে বাস করেন, যাকে একরকমের সমাধিই বলা যায়।

কিন্তু বৈষ্ণব সম্প্রদায় — যাঁরা শ্রীভগবানের সগুণ ও সাকার রূপের উপাসক ও সেই সগুণ ও সাকার শ্রীভগবানের সেবা করাই যাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য — তাঁদের মতে এই ভোগের জগৎ ও ত্যাগের জগৎ — এই দুই জগতের বাইরে আর একটি জগৎ আছে। সেই জগৎ হল প্রেমভক্তি ও আত্মনিবেদনের জগৎ। সেই আত্মনিবেদন হল শোষণের সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস। এই বিষয়ভোগের জগতে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে পারিপার্শ্বিককে শোষণ করছে কিন্তু সেই আত্মনিবেদনের জগতে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে পারিপার্শ্বিকের সেবাই করছে। শুধু তাই নয়, যিনি সবকিছুর কেন্দ্রে আছেন সেই শ্রীভগবানের সেবা করাই সেই জগতের প্রত্যেকের জীবনের

একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা প্রত্যেকে এক চেতনময় পরিপূর্ণতার অংশ হয়ে বেঁচে আছি। সুতরাং প্রত্যেক জীবাত্মার বা অনুচেতনার কর্ত্তব্য হল যিনি এই চেতনময় জগতের কেন্দ্রে আছেন সেই পরিপূর্ণ চেতনার প্রতি বিশ্বস্ত থাকা অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করা। শ্রীমদভাগবতে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ভগবানের কাছে জীবাত্মার আত্মসমর্পণকে গাছের গোড়ায় জল ঢালার সঙ্গে তুলনা করে।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হনমচ্যুতেজ্যা।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৪/৩১/১৪)

অর্থাৎ যেমন বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠরূপে জল সেচন করলেই তার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্রপুষ্প সকলেই সঞ্জীবিত হয় (মূল ব্যতীত পৃথকভাবে বিভিন্ন স্থানে জল সেচন করলে সেরকম হয় না) প্রাণে (অর্থাৎ উদরে) আহার্য্য প্রদান করলে যেরকম সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধন হয় (কিন্তু ইন্দ্রিয় সমূহে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অন্নলেপন দ্বারা সেরকম হয় না) সেইরকম একমাত্র অচ্যুতের (শ্রীকৃষ্ণের) পূজাদ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হয়ে যায় (তাঁদের আর পৃথক্ পৃথক্ পূজার প্রয়োজন হয় না)।

বৈদিক দর্শনেও আমরা দেখি যে সেখানেও এই কথাই বলা হয়েছে যে যাকে জানলে সব জানা হয়ে যাবে তাঁকেই জানার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বম্ ইদম্ বিজ্ঞাতং ভবতি
যস্মিন্ প্রাপ্তে সর্ব্বম্ ইদম্ প্রাপ্তম্ ভবতি
তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।।

সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে একজন আছেন যাকে জানলে সব জানা হয়ে যায়, যাকে পেলে সব পাওয়া হয়ে যায়। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তার পরম তাৎপর্য্য হল এই যে এই কেন্দ্রবিন্দুকে, এই পূর্ণব্রহ্মকে আমাদের সন্ধান করতে হবে। সুতরাং সেই কেন্দ্রে যিনি আছেন তাঁর সন্ধানে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। প্রথমে কারোর মনে হতে পারে এ এক হাস্যকর উক্তি — "যাঁকে জানলে সব জানা হয়ে

যায়, যাঁকে পেলে সব পাওয়া হয়ে যায়"— এ কিরকম কথা? এ কেবল পাগলের প্রলাপ!" তাই শ্রীমদভাগবতে একটি উপমা দিয়ে বলা হয়েছে যে যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলে সমস্ত গাছটি তার খাদ্য পায়, যেমন উদরে আহার দিলে সমস্ত শরীরের পুষ্টি হয়, সেরকম সবকিছুর কেন্দ্রে যিনি আছেন সেই শ্রীভগবানের সেবা করলে সকলেরই সেবা করা হয়। সেটা খুবই সম্ভব ও যুক্তিসঙ্গত এবং সেটি করার জন্যে সেই আত্মনিবেদনের ভূমিতে প্রবেশ করতে হবে। শোষণের স্তরকে পরিত্যাগ করে এবং ত্যাগের স্তরকেও পরিত্যাগ করে সেই আত্মনিবেদনের ভূমিতে প্রবেশ করতে হবে। আমাদের যে প্রকৃত স্বরূপ, আমাদের আত্মা, সেই জগতেরই বাসিন্দা। সেই জগতই প্রকৃত জগৎ আর এই জগৎ হল তার বিকৃত প্রতিবিম্ব।

সেই জগতই প্রকৃত সত্যের জগৎ যেখানে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে যিনি পরিপূর্ণ, যিনি সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন তাঁকে আত্মনিবেদন করে তাঁর সেবা করেন — যেমন সেই শরীরই সুস্থ যেখানে প্রত্যেক জীবকোষ সমস্ত শরীরের কল্যাণের জন্য কাজ করে। যদি কোন জীবকোষ শুধু নিজের জন্য কিছু করে, তবে পরিণতিতে সে এই দেহকে চরম শোষণ করবে। এইধরণের স্থানীয়, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য যে কাজ তা নিঃসন্দেহে খারাপ। একটি দেহের মধ্যেও প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক জীবকোষ সমস্ত দেহের কল্যাণের জন্য কাজ করে। সেইরকম এই সমগ্র জগতেরও একটি কেন্দ্র আছে এবং সেখান থেকে যে নির্দ্দেশ আসে, সেই নির্দ্দেশদ্বারাই এখানকার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে।

সেই কেন্দ্রে যিনি আছেন তাঁর অবস্থানটা কোথায়? শ্রীমদ্‌ভগবদ-গীতায় বলা হয়েছে,

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ

(শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ১৮/৬৬)

এখানে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন — "সমস্ত রকমের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করে শুধু আমার শরণাগত হও।"

এই তত্ত্বটি আমরা এখন অন্য এক দৃষ্টিকোন থেকে দেখব।

হেগেল একজন শ্রেষ্ঠ জার্ম্মান দার্শনিক ছিলেন এবং অনেকে তাঁর দর্শনকে পূর্ণতাবাদ (Perfectionism) বলে মনে করেছেন। তাঁর বিচার ছিল এই যে প্রত্যেক বস্তুর যিনি আদি কারণ, যিনি পরম সত্য, তাঁর অবশ্যই দুটি গুণ থাকবে। কি সেই দুটি গুণ? যিনি পরমসত্য তিনি নিজেই নিজের কারণ আর তিনি নিজের জন্যই নিজে আছেন অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছাই সবকিছুর উপরে।

এই বিষয়টি খুব অভিনিবেশ দ্বারা চিন্তা করতে হবে। তিনি নিজেই নিজের কারণ অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন, অন্য কেউ তাঁকে সৃষ্টি করেনি। যদি অন্য কেউ তাঁকে সৃষ্টি করত তবে সেই সৃষ্টি কর্ত্তার স্থানই মুখ্য হত। সুতরাং যিনি পরমেশ্বর তিনি নিশ্চয়ই অনাদি, অনাদিকাল থেকেই তাঁর অস্তিত্ব আছে এবং অন্য কেউ তাঁকে সৃষ্টি করেনি। যিনি পরমেশ্বর তাঁর এই গুণটি অবশ্যই থাকবে।

পরমেশ্বরের দ্বিতীয় গুণ হল এই যে তিনি নিজের জন্যই নিজে আছেন। তিনি নিজের অভিলাষ পূর্ণ করার জন্যেই আছেন, অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্যে নয়। যদি তাঁর অস্তিত্ব অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্যে হত, তবে তাঁর নিজের স্থান গৌণ হয়ে যেত আর যার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য তিনি আছেন তাঁরই স্থান মুখ্য হত।

সুতরাং পরমেশ্বরের এই দুটি গুণ অবশ্যই থাকবে। তিনি নিজেই নিজের কারণ এবং তিনি নিজেরই তুষ্টিবিধান করেন, নিজের অভিলাষ পূর্ণ করার জন্যে। যা কিছু ঘটে, যদি একটা ঘাস বা খড়কুটোও হাওয়ায় নড়ে, তবে তা শ্রীভগবানের অভিলাষ পূর্ণ করার জন্যেই ঘটে। প্রত্যেকটি ঘটনা, যা কিছু ঘটেছে ও ঘটবে, সবই শ্রীভগবানের তুষ্টিবিধানের জন্যে। সুতরাং তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লীলাই জগতের প্রকৃত জীবনতরঙ্গ। কিন্তু আমরা আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ দ্বারা চালিত হচ্ছি; পরিবারের স্বার্থ, দেশের স্বার্থ, সমাজের স্বার্থ অথবা মানুষের স্বার্থ ইত্যাদি। কিন্তু অনন্ত চেতনার মধ্যে এসব ক্ষুদ্র স্বার্থের স্থান অতি নগন্য। অথচ এই ক্ষুদ্র, স্বতন্ত্র স্বার্থ সাধনেই আমরা ব্যস্ত আছি। অসংখ্য রকমের স্বতন্ত্র স্বার্থের মধ্যে এক অবশ্যম্ভাবী সংঘাত সৃষ্টি হয় আর তাঁর থেকেই যত দুঃখকষ্টের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই তথাকথিত স্বতন্ত্র স্বার্থ সাধনের প্রয়াসকে আমাদের ত্যাগ করা

উচিত; এই ভুল ধারণার জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের চেষ্টা করা উচিত এমন এক সমষ্টি বা গোষ্ঠীর অংশ হওয়া যা এক পরিপূর্ণ সমষ্টির সেবা করছে।

শ্রীভগবদ্গীতার উপসংহারে কৃষ্ণ এই সিদ্ধান্তই দিয়েছেন যে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"— সর্ব্বরকমের ধর্ম্ম ও সর্ব্বরকমের কর্ত্তব্য যা তুমি মনে কর তোমার পালন করা উচিত সে সব ত্যাগ কর এবং "মামেকং শরণং ব্রজ"— তুমি আমারই শরণাগত হও —

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।
(শ্রীমদভগবদ্গীতা ১৮/৬৬)

অর্থাৎ (যা কিছু তোমার ধারণায় আসে) সেসব পাপ বা কর্ম্মফল ও দুঃখ থেকে আমি তোমাকে মুক্ত করব, তুমি শোক কোর না।

অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে যিনি সবকিছুর কেন্দ্রে আছেন তাঁর প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকতে হবে। বর্ত্তমানে আমাদের সব কর্ত্তব্য কেবল স্থানীয়, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে। কিন্তু এই স্থানীয়, ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্গে একাত্মা হয়ে থাকার প্রয়াসকে ত্যাগ করে যিনি পরিপূর্ণ ও অনন্ত চেতনা, তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করার কাজে আমাদের নিজেদের নিঃশেষে বিলীন করে দিতে হবে।

এটাও আমরা দেখি যে যদি কোন পুলিশ অফিসার নিজের স্বার্থে কারোর কাছ থেকে সামান্য কটা টাকাও নেন, তবে তাঁর জন্যে তাঁর শাস্তি হতে পারে, কিন্তু তিনি যদি দেশের স্বার্থে বহু লোককে হত্যাও করেন, তবে তাঁর জন্যে হয়ত তাঁর পুরস্কার মিলবে। সেইরকম যিনি পরিপূর্ণ তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে যা করা হয় সবই শুভ, কিন্তু নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে বা নিজের কোন স্থানীয় বন্ধুর স্বার্থের জন্যে যা করা হয় তার কর্ম্মফল পেতে হবে। কোন কারখানায় কারও নিজের স্বার্থে ঘুষ নেওয়ার অধিকার নেই আবার একই সঙ্গে ধর্ম্মঘট করে সকলের চাকরী খুইয়ে কারখানা বন্ধ করে দেওয়ারও অধিকার নেই, কারণ এতে সেই শিল্পবাণিজ্য একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।

সুতরাং শোষণ বা ত্যাগ কোনটাতেই কাজ হবে না। শোষণ যে খারাপ সে তো পরিস্কার বোঝাই যায়। আর যেহেতু এই জগতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা ধর্ম্মঘট করারও কোন অধিকার আমাদের নেই, তাই ত্যাগের পথও অশুভ। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সমষ্টি নিয়েই এই সমগ্র জগৎ। তাই আমাদের সার্ব্বজনীন কল্যাণ তখনই হবে যখন আমরা এই জগতের কেন্দ্রে যিনি আছেন তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করব, কারণ তাঁর মধ্যেই এই সমগ্র জগৎ রয়েছে। যখন আমরা পাকস্থলীতে খাদ্য পাঠাই, তখন পাকস্থলী সেই খাদ্য সমস্ত শরীরে যথাযথভাবে সরবরাহ করে, প্রত্যেক অংশ তার প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য পায়। এই রকমের জীবনযাত্রাই হল বৈষ্ণব জীবনযাত্রা। সমস্ত অংশের সমষ্টি নিয়ে যে পরিপূর্ণতা আমরা প্রত্যেকে তারই অংশ। আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের নিজের বিশেষ সেবা বা কর্ত্তব্য আছে যা সেই পরিপূর্ণতার সঙ্গে, সেই কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত আর সেই সেবার মাধ্যমেই আমরা সেই পরিপূর্ণতার কাছে নিজেদের উৎসর্গ করতে পারি। চোখে, নাকে বা কানে খাদ্য না দিয়ে আমরা পাকস্থলীতে খাদ্য পাঠাই, কারণ সেটাই সবচেয়ে কল্যাণকর — সেখান থেকেই শরীরের অন্য সব জায়গায় সুষ্ঠুভাবে সেই খাদ্য পরিবেশিত হবে, এবং সমগ্র দেহ তাতে পুষ্ঠ হবে। আমরা প্রত্যেকেই সমগ্র বিশ্বের অংশ এবং আমাদের কর্ত্তব্য হল এক পরিপূর্ণ জগতের সেবা করা আর তাই হল ভক্তি, আত্মনিবেদন ও শরণাগতি। কি করে আমরা এ বিষয়ে জানব? আমাদের সাহায্য আসবে শাস্ত্র থেকে আর সাধুরাও আমাদের পথ দেখাবেন। আর যাঁরা শ্রীভগবানের বিশেষ প্রতিনিধি হয়ে সেই চিন্ময় স্তর থেকে আসছেন তাঁরা আমাদের জীবনে আনবেন সুসঙ্গতি, সামঞ্জস্য, এক চেতনময় মধুর ঐক্যতান।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব আমাদের সেই ধর্ম্ম দিয়েছেন যে ধর্ম্মে সর্বোচ্চ সুসঙ্গতি আছে, যে ধর্ম্মে সর্বোচ্চ সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। শ্রীমদভাগবতমকে সমস্ত শাস্ত্রের, বেদ-বেদান্তের সারমর্ম বা উপসংহার বলা হয়ে থাকে। আর সেই শ্রীমদভাগবতমের ভিত্তিতে তিনি তাঁর ভক্তিতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন। এইভাবে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে শক্তি বা ক্ষমতাই সর্বোচ্চ বস্তু নয়, জ্ঞানের স্থান তাঁর উপরে। জ্ঞান ক্ষমতাকে

নিয়ন্ত্রন করতে পারে এবং তখন তাঁর একটা কল্যাণকর ফল হয়। কিন্তু আরও এগিয়ে গেলে আমরা দেখব যে জ্ঞানেরও উপরে কিছু আছে তা হল ভক্তি, প্রেম, প্রীতি এবং তারই স্থান সবার উপরে। জীবনের প্রকৃত আনন্দময় পরিপূর্ণতা জ্ঞান বা শক্তি থেকে আসতে পারে না, তা কেবল আসতে পারে প্রেমভক্তি থেকে, প্রীতি থেকে।

করুণার স্থান হল ন্যায়বিচারের উপরে। যেখানে আইন কানুনের প্রয়োজন আছে কেবল সেখানেই ন্যায়বিচারের অস্তিত্ব থাকতে পারে। কিন্তু যিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, সেই পরমেশ্বর, যিনি পরম মঙ্গলময়, তাঁর স্বধামে আইন কানুনের প্রয়োজন নেই আর তাই সেখানে ন্যায়বিচারেরও প্রয়োজন নেই, সেখানে আছে কেবল করুণা, প্রেম ও প্রীতি। কারণ তিনি পরম মঙ্গলময় ও পরম প্রেমময়, তাই তাঁর প্রেমময় শক্তিকে কোন আইনকানুন দিয়ে নিয়ন্ত্রন করার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। পরম মঙ্গলময় শ্রীভগবান হলেন পরম প্রেম ও প্রীতির আধার, তিনি যেখানে আছেন সেখানেই আমাদের প্রকৃত বাসভূমি, আমাদের স্বধাম, আমাদের সুখনিকেতন। সেই প্রেমময় ভগবানের কাছে, সেই নিজের গৃহে আমাদের ফিরে যেতে হবে। কোথায় আমাদের সেই গৃহ? যেখানে আমরা দেখব যে আমরা তাঁদের মাঝখানেই আছি যাঁরা আমাদের প্রকৃত ভালবাসেন, যাঁরা আমাদের প্রকৃত শুভাকাঙ্খী। সেখানে যদি আমরা নিজেদের মঙ্গলের জন্যে নাও চিন্তা করি তবু কতজন সেখানে আমাদের ভার নেবেন, আমাদের দেখাশোনা, লালনপালন করবেন। প্রকৃতপক্ষে সেখানে চারপাশের সকলেই, সমস্ত পারিপার্শ্বিকই আমাদের লালনপালন করবে। আর সেই হল আমাদের আপন গৃহ, আমাদের সুখনিকেতন। সেই হল পরমেশ্বরের রাজ্য আর সেখানে আমরা তাঁকে সেবা করার অধিকার পেয়েই আমাদের সর্বোচ্চ পরিণতি লাভ করতে পারি। সেখানে যে অচিন্ত্যনীয় প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, সৌন্দর্য্য, একতা ও সুখসঙ্গতি আছে তাও আমরা তখনই অনুভব করব। এইসব গুণের পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য আছে আর যিনি পরম মঙ্গলময় অনাদি কারণ তিনি এইসব গুণেরই অনন্ত সমষ্টি। তাঁর স্বধামেই আমাদের যেতে হবে।

কোন না কোন সময়ে, কোন না কোনভাবে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহার করে আমাদের গন্তব্য থেকে আমরা দূরে চলে

গেছি, বিপথগামী হয়েছি। কিন্তু এখন আবার আমাদের ডাক দেওয়া হচ্ছে, "চলে এসো তোমরা। শ্রীভগবানের কাছে ফিরে এসো, নিজের বাড়ীতে ফিরে এসো। সেই প্রেমের জগতে, যেখানে আছে তোমাদের সর্বোচ্চ পরিণতি, সেখানে ফিরে এসো।" ভগবৎগীতায় ও শ্রীমদ্ভাগবতে যে কৃষ্ণভক্তির তত্ত্ব দেওয়া হয়েছে এই হল তাঁর সারমর্ম বা উপসংহার আর শ্রীমন মহাপ্রভুও আমাদের এই তত্ত্বটিই দিয়েছেন। এই তত্ত্বটিই আমি আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করেছি। এই শ্রীচৈতন্যসারস্বতমঠ এবং সমগ্র গৌড়ীয় মঠ শুধু এই তত্ত্বটি পরিবেশন করার জন্যই প্রচারকার্য্য চালাচ্ছেন। "জীবনের কেন্দ্রে যিনি আছেন সেই ভগবানের দিকে এগিয়ে যাও। এই মানব জীবনকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে দাও সেই ভগবানের সেবায়, যিনি আছেন ন্যায় বিচারের ঊর্দ্ধে — যিনি পরম করুণাময়, পরম প্রেমময়, পরম স্নেহময়, পরম সুন্দর।"

এই হল বৈষ্ণব ধর্ম্মের, ভগবদ্গীতার, শ্রীমদ্ভাগবতের বৃহৎ পটভূমিকা। আর সমস্ত ধর্ম্মীয় তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত মর্ম হল এই যে শোষণ, ত্যাগ ও আত্মনিবেদন হল জীবনের তিনটি স্তর কিন্তু জীবের প্রকৃত স্বরূপ যে আত্মা, সে সেই আত্মনিবেদনের ভূমিরই বাসিন্দা। সকলেরই অস্তিত্ব আত্মনিবেদনের জন্যে, কিন্তু কোনভাবে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বাধীনতার অপব্যবহার করে আমরা এই শোষণের জগতে প্রবেশ করেছি। যাঁরা এই শোষণের জগৎ থেকে এই কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে যেতে চান, তাঁদের বৌদ্ধ, জৈন, বা পরেশনাথের অনুগামীরা আরও অনেকে সাহায্য করতে চান সম্পূর্ণ ত্যাগের ভূমিকায় নিয়ে যেতে। তারা মনে করেন যে এইরকমভাবে এই কর্ম্মফলের জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলে, এখান থেকে অবসর নিলে, আত্মা সুখে থাকতে পারে। তবুও তাঁর আবার কোন না কোন সময় এই জগতের বেড়াজালের ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা একটা থেকেই যায়। কিন্তু যেখানে সত্যিকারের মুক্তজীবরা বাস করেন সেখানে সকলেই আত্মনিবেদনের ভূমিকায় আছেন। আর যখন আমরা অনুসন্ধান করব যে কি আছে সেই আত্মনিবেদনের স্তরে যা তাঁদের সুসঙ্গতি, সামঞ্জস্যের মধ্যে রেখেছে, যা তাঁদের ভরণপোষণ, লালনপালন করছে তখন দেখব তাঁদের বিশেষত্ব হল এই যে তাঁরা সকলেই এক পরিপূর্ণতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন

আর সেই পরিপূর্ণতা আছে যিনি পরম মঙ্গলময়, তাঁরই মধ্যে। এই সবকিছুই আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে আর তারই জন্যে এই মানবজীবন বড় মূল্যবান। সাধুসঙ্গ পেয়ে, শ্রীভগবানের প্রতিনিধিদের সঙ্গ পেয়ে আমরা যেন প্রাণপণ চেষ্টা করি এই বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে গিয়ে সেই প্রেম, প্রীতি ও আত্মনিবেদনের চিন্ময় ভূমিতে প্রবেশ করার জন্যে।

ইতিমধ্যেই আমাদের মঠ থেকে বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া অনেক প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থও আছে যা এই সনাতন ধর্ম্মের নানাতত্ত্বকে বিশদভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুখনিকেতন

যেখানে আছে আমাদের নিজেদের বাড়ী, আমাদের সুখনিকেতন, সেখানেই আছে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও সমস্ত রকমের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম। সব কিছুই সেখানে আছে। এ এমন এক জায়গা যেখানে সহজতঃই বিশ্বাস, ভালবাসা, স্নেহপ্রীতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত আদানপ্রদান রয়েছে। সেখানে যে সুখশান্তি, নিরাপত্তা, সৌন্দর্য্য প্রেম ইত্যাদি আছে তা আমাদের পক্ষে অচিন্ত্যনীয়। তাই উপনিষদ আমাদের এই উপদেশ দেন, "সেই অচিন্তনীয় ভূমিকে তোমরা যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা কোর না। সেই চিন্ময় জগতের অস্তিত্ব তোমাদের চিন্তাশক্তির বাইরে। সেই জগৎ অন্য নিয়মে চলে। তোমাদের এই জগতের অঙ্কের মাপজোক হিসেব নিকেশের দ্বারা তোমরা কেবল ঘনবস্তু ও বিন্দু ও রেখার সঙ্গে পরিচিত আছে। বর্ত্তমানে তোমরা এই ঘনবস্তুর জগতের জীব, আর রেখা ও বিন্দুর সঙ্গেও তোমাদের একটা সীমিত যোগাযোগ আছে, অস্পষ্ট ভাবে। সুতরাং সেই চিন্ময় বস্তু, যার সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান বা ধারণা নেই, তাকে তোমরা কেমন করে মেপে নেবে? সেই জগতের রীতিনীতি, সেখানকার জীবনযাত্রা সবই তোমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা, তাই তা নিয়ে তোমরা বিতর্ক করতে পার না। সেই জগতের প্রকৃতি একেবারে অন্যরকম।"

যদি আমাদের ধারণা সীমাবদ্ধ থাকে জলের প্রকৃতি সম্বন্ধে তবে তাঁর দ্বারা আমরা হাওয়ার সম্বন্ধে কি ধারণা করতে পারি? আর যদি হাওয়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু জানা থাকে তবে কি তাঁর দ্বারা আমরা আকাশের পরিমাপ করতে পারি? "তাই তোমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষার গবেষণাগারে এমন সব বস্তু আমদানি করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পোড়ো না, যার প্রকৃতি তোমাদের চিন্তাশক্তির আওতায় আসে না। সেটা কেবল মূর্খতা।"

উচ্চতর বস্তুর, চিন্ময় বস্তুর অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এ জগতের সাধারণ লোকের সে সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। আমাদের জ্ঞান আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই অভিজ্ঞতা থেকে কিছু জ্ঞান আমাদের নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু সেই জ্ঞানের মান ও পরিমাণ খুব সামান্য। যা আমাদের নাগালের বাইরে তার পরিমাপ করার প্রচেষ্টা আমরা করতে পারি না। কিন্তু যাঁদের সেইসব বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা যদি আমাদের কাছে সে সম্বন্ধে কিছু বলেন তাহলে আমাদের খানিকটা ধারণা হতে পারে এবং আমরা সে সম্বন্ধে একটা তুলনামূলক বিচারও করতে পারি। যেমন একজন গবেষক, যাঁর আকাশ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আছে, তিনি একরকম বলেছেন। অন্য একজন গবেষক- তাঁরও আকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান আছে,— তিনি এ সম্বন্ধে আরও অন্য কিছু বলেছেন। এইভাবে তাঁদের গবেষণা ও তাঁদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে আমাদেরও কিছু ধারণা হতে পারে।

যাঁরা তাঁদের গবেষণার টেলিস্কোপ ব্যবহার করেন আমরা তাঁদের গবেষণা সম্বন্ধে একটা একটা তুলনামূলক বিচার করতে পারি। আমরা দেখব যে একজন গবেষক তাঁর টেলিস্কোপ ব্যবহার করে একরকমের গবেষণা করেছেন ও আর একজন তাঁর টেলিস্কোপ ব্যবহার করে আর একরকমের গবেষণা করেছেন। এ সম্বন্ধে যে জ্ঞান আমাদের হল তার থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে হয়ত কোন বিশেষ টেলিস্কোপ কোন বিশেষ গবেষণার ক্ষেত্রে অন্য টেলিস্কোপ থেকে বেশী ক্ষমতাশালী। সুতরাং আমাদের নিজেদের টেলিস্কোপ না থাকলেও আমাদের একটা সীমিত ক্ষমতা আছে, যা আমাদের দৃষ্টিশক্তির বাইরে, যার দ্বারা টেলিস্কোপে যা আবিস্কার করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে একটা তুলনামূলক বিচার করাও সম্ভব।

সেইরকম সেই চিন্ময় বস্তু যাকে হৃদয়ের ''টেলিস্কোপ'' বা আত্মার ''টেলিস্কোপ'' দিয়ে দেখা যায়, শাস্ত্র থেকে আমরা তাঁর সম্বন্ধেই জানতে পারি। সাধুরা এই বিষয় সম্বন্ধে অবগত আছেন আর সেই চিন্ময় ভূমিতে প্রবেশ করতে গেলে আমাদের তাঁদেরই সাহায্য নিতে হবে। বর্ত্তমানে আমাদের সেই চিন্ময় জগৎ সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সাধু ও শাস্ত্রের আনুগত্যে তাঁদের সাহায্য নিয়ে, আমরাও

সেইরকম 'টেলিস্কোপ' পেতে পারি যার দ্বারা সেই উচ্চতর, চিন্ময় অভিজ্ঞতা আমাদের হতে পারে।

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ

শ্রীমদ্ভাগবতম (১১/২১/২)

অর্থাৎ "যার যেখানে অধিকার আছে তাঁর সেখানে নিষ্ঠা থাকাই তার গুণ।" সুতরাং যে বিষয়ে অধিকার জন্মায়নি, সে বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করা উচিত নয়।

'অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ' অর্থাৎ অচিন্ত্য ভাবে তর্ক যোজনা করবে না, প্রাচীন পন্ডিতগণ এই উপদেশ দিয়েছেন, যেহেতু অচিন্ত্য বিষয়ে তর্ক কখনই প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না।

সুতরাং একটা তর্কের প্রবণতা এসে যেন অন্য সবকিছুকে ঢেকে না দেয়। তর্কই সব নয়, এমন নয় যে সমস্ত রকমের বিশ্বাস কেবল যুক্তি তর্ককেই আশ্রয় করে থাকবে। চিন্ময় জগৎ হল অচিন্ত্য, ধারণার অতীত, তবুও আমাদের নিজের নিজের ক্ষমতা, বিশ্বাস ও উপলব্ধি অনুযায়ী তাকে আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে। সবার উপরে এই ধারণাটা আমাদের মনের মধ্যে রাখতে হবে যে মাধুর্য্য হল মধুর আর সত্য হল সত্য আর সেখানে আমরা তারই পরম পরাকাষ্ঠা দেখছি। কিন্তু এখানকার কোন মাপকাঠি নিয়ে আমরা সেই চিন্ময় জগতের পরিমাপ করতে পারি না।

যদি একজনের চোখ থাকে আর একজনের না থাকে, তাহলে যে অন্ধ সে নিশ্চয়ই যার চোখ আছে তাঁর সাহায্য নেবে। আমাদের ভিতরে কি আছে সে সম্বন্ধে আমরাও নিশ্চয়ই অন্ধ তা না হলে আমরা চিকিৎসকের পরামর্শ নিই কেন? আমরা যা দেখতে পাই না চিকিৎসক তা দেখতে পান; তিনি প্রথমে আমাদের রোগনির্ণয় করবেন তারপর আমাদের চিকিৎসা শুরু হবে। স্বভাবতঃই তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকবে এবং তাঁর সাহায্যের জন্যে তাঁকে আমরা কিছু দক্ষিণাও দেব — এ তো খুবই যুক্তিযুক্ত।

সেইরকম গুরুদেব হলেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তাঁর যোগ্যতাও আমরা তখনই বুঝতে পারব যখন আমরা দেখব তিনি যা বলছেন সে সবই সত্য, তা কাল্পনিক নয়। এইরকমের দর্শনও নির্ভর করবে আমাদের চোখের দৃষ্টি কতখানি খুলেছে তাঁর উপর। যিনি অন্ধ, কোন সুযোগ্য চিকিৎসক যদি তাঁর চিকিৎসা করেন, তবে তিনিও ক্রমশঃ ক্রমশঃ দেখবেন যে "হ্যাঁ আমি কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছি, আমার এখন কিছু চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ঘটছে।" এই ঘটনার পর থেকে তিনি আর অন্য অন্ধ লোকেরা যেসব কল্পনাপ্রসূত মতামত জাহির করে, তার কোন দাম দেবেন না। কারণ তিনি তো এখন নিজের চোখেই সব দেখতে পাচ্ছেন। এই দৃষ্টিশক্তি পাওয়ার ফলেই তিনি বুঝবেন যে তিনি যে ঔষধ ব্যবহার করেছেন তাতেই সত্যিকারের কাজ হয়।

বৈজ্ঞানিক বিষয়কেও আমরা এইভাবেই বুঝি। প্রথমদিকে মাইকেল ফ্যারাডে যখন ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুতের নিয়মকানুন আবিস্কার করছিলেন তখন অনেকেই তা শুনে উপহাস করেছিল। "এটা কি ব্যাপার? এটা একটা ছেলেমানুষী কৌতূহল মাত্র। এই ইলেকট্রিসিটি আমাদের কি কাজে লাগবে?" যখন ফ্যারাডে তাঁর গবেষণার ফল প্রদর্শন করছিলেন তার একটা বিবরণ আমি কোথাও পড়েছিলাম। তিনি একটা যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করলেন। তারপর দেখালেন যে কতকগুলো ছোট ছোট কাগজের টুকরো সেই বিদ্যুৎতরঙ্গ দ্বারা চালিত হয়ে এদিক ওদিক নড়ছে। অনেকেই তাঁর এই আবিস্কার দেখে সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু একজন ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, "কিন্তু এত কান্ডের পর, মিষ্টার ফ্যারাডে, আপনার এই বিলাসিতার খেলা থেকে কারো কি সত্যিকারের উপকার হবে?" তখন ফ্যারাডে বললেন, "আপনি কি বলতে পারেন, একটি নবজাত শিশুই বা আমাদের কি কাজে লাগে?" তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে একটি শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন অন্য সকলে তার দেখাশোনা করে, কিন্তু সেই শিশু যখন বড় হয়, প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন তার শক্তি, তার দক্ষতার দ্বারা অনেক কাজ হবে। সেইরকম অনেকে মনে করেন যে ভগবৎচিন্তা একটি বিলাসিতা বা ফ্যাশন বা ছেলেখেলা — এর কোন সত্যিকারের উপযোগিতা নেই। কিন্তু সেই ভগবৎচিন্তাই যখন খুব প্রগাঢ় ও ঐকান্তিক হয়ে ওঠে, তখন

সেই অভিজ্ঞতা যাঁদের হয় তাঁদের কাছে এ জগতের অন্যসব কাজকর্ম্ম- তা যতই জরুরী হোক না কেন, তা মূল্যহীন মনে হয়। কেন না আমাদের চরম আকাঙ্খা হল এই যে আমরা বাঁচতে চাই। মরতে আমরা কখনই চাই না। আমাদের সকলের মধ্যেই এই বাঁচার ইচ্ছে সবচেয়ে প্রবল, এই বাঁচার তাগিদই সবচেয়ে বড় জিনিস। এটা কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে তারা সকলেই বাঁচতে চায়, শুধু তাই নয়, বাঁচার মত বাঁচতে চায়, সুখী হয়ে, সচেতন হয়ে বাঁচতে চায়। সমস্ত রকমের দুঃখকষ্ট থেকেও আমরা মুক্তি চাই।

যখন কারোর ভিতরে ভগবৎচেতনা জেগে ওঠে তখন সে খুব পরিস্কারভাবেই বুঝতে পারে যে এই জগতের সমস্যাটা কি; তখন তার মনে হয় ‘‘কেন এই জড়জগতে সবাই এক অলীক জিনিসের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছে? সকলেই এ জগতে সুখ চায়, কিন্তু সকলেই এখানে এক কাল্পনিক, অলীক সুখের পিছনে ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে।’’

জড় জিনিসে, মর্ত্ত জিনিসে কখনও সুখ থাকতে পারে না। আমরা এই নশ্বর, জড় জগতের সঙ্গে একটা লেনদেন করছি, একটা ব্যবসা করছি, কিন্তু এর থেকে কখনই আমাদের সত্যিকারের সুখ বা সন্তোষ আসতে পারে না। এখানকার এই সুখের প্রচেষ্টায় কেবল আমাদের শক্তিই ক্ষয় হবে। একদিক থেকে আমরা সংগ্রহ করব, আর একদিক থেকে তা ক্ষয় হয়ে যাবে। কোন বিচক্ষণ মানুষ কখনও এই ধরণের শক্তিক্ষয়কে, এইধরণের অপচেষ্টাকে তাঁর জীবনের লক্ষ্য বলে মেনে নিতে পারেন না। যিনি বিচক্ষণ তিনি বুঝবেন যে এছাড়াও অন্য একস্তরের জীবনযাত্রা নিশ্চয়ই আছে। তিনি বুঝবেন যে এই নশ্বর সংসারে যে জীবন মৃত্যুর খেলা চলছে তিনি সেই খেলা আর খেলতে চান না। এই নশ্বর লেনদেনের অংশীদার তিনি আর হতে চান না। তাঁর এই উপলব্ধি হবে যে, ‘‘আমি তো অমৃতের সন্তান! আমি তো সেই চিন্ময় জগতেরই বাসিন্দা। তবুও কেমন করে জানিনা আমি এই নশ্বর অস্তিত্বের বেড়াজালে বন্দী হয়ে গেছি। এখন কোনরকমে যদি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আমি এই বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে যেতে পারি, তবেই আমি আমার স্বস্থানে ফিরে যেতে পারব।’’ তিনি বুঝবেন যে তাঁর যে স্বরূপ, তাঁর যে আত্মা,— যে কিনা চেতনা ও অনুভূতির আধার

— সে এক অন্য জগতের বাসিন্দা। কিন্তু আপাততঃ তিনি এই নশ্বর ও ক্লেশকর জড় জগতে বন্দী হয়ে আছেন। আর এই জগৎ বড় দুঃখময়। তাঁর এই উপলব্ধির জোরেই তিনি চিন্ময় জগতের দিকে যাত্রা করার শক্তি পাবেন। এই উপলব্ধিই তাঁর প্রগতির পথে সহায় হবে।

যতই আমাদের জীবনে চিন্ময় উপলব্ধি আসবে, যতই আমরা তাঁর অপ্রাকৃত প্রমাণ দেখবো, ততই আমাদের মনে হবে যে "হ্যাঁ, এখন আমি যা দেখছি, যা শুনছি, যে অভিজ্ঞতা আমার হচ্ছে, তা আমার কাছে আমার চারপাশের জগৎ থেকে অনেক বেশী বাস্তব, অনেক বেশী সত্য। বরং এই জগতকেই আমার অস্পষ্ট, কুহেলিকাময় মনে হচ্ছে। কিন্তু এই চিন্ময় জীবনের পথে আমি যা দেখছি ও শুনছি তাঁর মধ্যে কোন কুহেলিকা নেই, তা সবই সন্দেহাতীত ভাবে সত্য।"

আত্মার সঙ্গে, শ্রীভগবানের সঙ্গে, শ্রীভগবানের দিব্যধামের সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হওয়া খুবই সম্ভব। বরং আমরা এখন যেখানে আছি সেখানকারই সব যোগাযোগ হল পরোক্ষ। এই জগতের সঙ্গে কোন অভিজ্ঞতা হওয়ার আগে প্রথমে আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারা, চোখ, কান ইত্যাদি দ্বারা অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে হবে, তারপর সেই অভিজ্ঞতা যাবে মনের কাছে, যাতে মন তাঁর বিশ্লেষণ করতে পারে। কিন্তু আত্মার জগতে আমরা সবকিছু প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি ও অনুভব করতে পারি, অন্য কোন যন্ত্রের (যেমন ইন্দ্রিয়ের) সাহায্য ছাড়াই।

অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে আমরা এক জিনিস দেখি আর খালি চোখে আর এক জিনিস দেখি। দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। চোখ, কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের এ জগৎ সম্বন্ধে একরকমের অভিজ্ঞতা হয়। কিন্তু যখন আমরা আত্মার জগতে প্রবেশ করি তখন এই নেতিবাচক জড়জগতে আমাদের যে তথাকথিত উন্নতি বা সমৃদ্ধি হয়েছে তার থেকে যদি আমরা নিজেদের সরিয়ে ফেলতে পারি, তবেই আমাদের এক নতুন উপলব্ধি হবে। তখন আমরা অনুভব করব, "ও, এই হল আমার আত্মার স্বরূপ!" তখন আমি প্রত্যক্ষভাবে, ইন্দ্রিয়াদি যন্ত্র বা কোনরকমের বাহ্যিক সাহায্য ছাড়াই, উপলব্ধি করব যে কে আমি।

আত্মা নিজেকে দেখতে পারে, নিজের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে

ও আত্মদর্শনের দ্বারা নিজের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারে। অন্য কোন যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই, কেবলমাত্র আত্মদর্শনের দ্বারাই আত্মার নিজের সম্বন্ধে সর্ব্বরকমের তত্ত্বের সম্যক ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হতে পারে। তখন সে বুঝবে তাঁর প্রকৃত বাসভূমি কোথায়। তখন সেই চিন্ময় জগৎ সম্বন্ধে তাঁর একটা উপলব্ধি হবে। আর চিন্ময় জগতের সেই অমৃতময় স্বাদ পেয়ে সে আবিস্কার করবে, "আমার মৃত্যু নেই।"

এই জড়জগৎ হল ভুল ধারণার জায়গা যেখানে প্রকৃত তত্ত্ব বিকৃত হয়ে যায়। কিন্তু সেই উচ্চতর জগতে এই রকমের ভুল ধারণার কোন সম্ভাবনা নেই। একবার সেখানে প্রবেশ করলে আমাদের ধ্যান-ধারণা, — তা যতই সীমাবদ্ধ হোক না কেন, খুব স্পষ্ট হবে ও তা কেবল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই অভিজ্ঞতা যারই হবে তারই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস খুব দৃঢ় হবে এবং সে চাইবে সুদৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে সেই পথে এগিয়ে যেতে।

সক্রেটিস বুঝতে পেরেছিলেন যে আত্মার মৃত্যু নেই। তাঁর এই উপলব্ধি এত প্রগাঢ় ছিল যে তিনি এই পৃথিবীতে তাঁর বেঁচে থাকার কোন মূল্য আছে বলে মনে করেননি। তিনি এই জগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগকে খুব অবহেলার সঙ্গে ছিন্ন করে দিয়েছিলেন, কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আত্মা হল মৃত্যুহীন। যীশুখ্রীষ্টেরও ভগবানের উপর, তাঁর প্রভুর উপর এত গভীর বিশ্বাস ছিল যে তিনি এ জগতের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। এ জগতের সব সুখ দুঃখকে তিনি খুব অবহেলার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

অনেক কিছুই, যা এই রক্তমাংসের চোখে অদৃশ্য, তা জ্ঞান-উন্মিলীত চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়। আমরা এই সিদ্ধান্ত সহজেই নিতে পারি যে জ্ঞানের দৃষ্টিতে যা দেখা সম্ভব, তা রক্তমাংসের দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব নয়। ঠিক সেইরকম আর এক গভীর নিগূঢ় দৃষ্টি আছে যার দ্বারা আমরা সব কিছু অন্যভাবে, এক নতুন আলোকে, এক আশাপ্রদ, আশ্বাসময় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারি। সেই চিন্ময় জগতের চিন্ময় দৃষ্টি যেন আমাদের ডাক দিয়ে বলছে, "এসো, দেখো এই অভাবনীয়, অচিন্ত্যনীয় বস্তু!" যে চোখে ছানি পড়েছে সে চোখ দেখতে পায় না,

কিন্তু চোখের ছানি কাটিয়ে নিলেই সে দেখতে পায়। অজ্ঞানতা হল চোখের ছানির মত, তা আমাদের অন্ধ করে রাখে। এমনিতে আমাদের দৃষ্টি খুব অগভীর, কিন্তু অন্য এক গভীর দৃষ্টির দ্বারা আমরা অনেক কিছুই দেখতে পাই। এই চোখের পিছনে যখন জ্ঞান চক্ষু সংযোজিত হয়, তখন অনেক কিছুই আমাদের দৃশ্যগোচর হয় এবং উত্তরোত্তর গভীর হয় সেই দৃষ্টি।

সর্ব্বদা আমরা যা দেখছি সেই বাহ্যিক দৃষ্টির কোন মূল্য নেই। যাঁর দৃষ্টিশক্তির গভীরতা আছে তাঁরই দর্শনের মুল্য আছে। সকলেই বা সবকিছু সমানও নয়। যাঁরা জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও সত্যদ্রষ্টা, তাঁদের মধ্যেও কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমের ভেদ আছে। উপলব্ধিরও তারতম্য আছে এবং প্রত্যেকের দর্শন তাঁর নিজের নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী হবে।

এটা আমরা খুব সহজেই দেখতে পাচ্ছি যে বর্ত্তমানে আমরা এই মৃত্যুময় জগতের বাসিন্দা। কিন্তু কিসের দ্বারা আমরা তাঁর সঙ্গে জড়িত? আমাদের এই দেহটাই এই জগতের বাসিন্দা। যদি আমরা এই দেহের স্তরের উপরে উঠতে পারি, তখন আমরা মনের স্তরে পৌঁছাব, সেখান থেকে আমরা বুদ্ধির স্তরে যেতে পারি, তারপরে আমরা আত্মার স্তরে পৌঁছাব। তখন আমরা দেখব যে, যে ভূমিতে আত্মা বাস করে তা হল নিত্য, এবং আত্মাও নিত্য। সেখান থেকে আমরা পরমাত্মার সন্ধানে যেতে পারি যিনি আমাদের সমস্ত চিন্তাভাবনার উৎস। পরমাত্মা হলেন সূর্যের মত, যে সূর্য সব আলোকরশ্মির উৎস। একবার সূর্যের কোন আলোকরশ্মিকে দেখতে পেলে তাকে ধরে আমরা সেই সূর্যের দিকে এগোতে পারি, যে সূর্য সব আলোকরশ্মির উৎস। তেমনি যখন আমাদের নিজেদের স্বরূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা হবে, যখন আমরা নিজেদের অনুচেতনা বলে জানব, তখনই আমরা পূর্ণচেতনার সন্ধানে যেতে পারি, যে পূর্ণচেতনার ভূমিতে সবকিছু অনন্ত ও সৎচিদানন্দময়। এইভাবে আমরা, যিনি অনাদি ও সর্ব্বকারণের কারণ, তাঁর দিকে এগোতে পারি। কিন্তু শুধু নিজেদের ইচ্ছা ও স্বাধীনতার জোরেই সেখানে আমরা যেতে পারি না, সেই চিন্ময় ভূমি থেকেও কোনও সাহায্য আমাদের অবশ্যই দরকার। সেই সাহায্য আসবে গুরুদেবের মাধ্যমে, বৈষ্ণবের মাধ্যমে। তাঁদের সাহায্য নিলেই আমাদের লক্ষ্যসাধনের পথে সত্যিকারের উন্নতি

হবে। বর্ত্তমানে আমরা মনে করি যে আমাদের চারপাশে যা দেখছি সে সবকিছুরই আমরা প্রভু বা মালিক। কিন্তু আমরা যা দেখছি সে সবই তো ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর। আর সে সব কিছু থেকেই আমাদের জীবনে একটা প্রতিক্রিয়া বা কর্ম্মফল আসবে। এখানকার সব কিছু খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে এখানে সবকিছুরই একটা প্রতিক্রিয়া আছে। আজ এখানে যা সুখের, কাল এখানে তা দুঃখের হয়ে যাবে। তাই আমাদের অন্য কোথাও একটা মঙ্গলময় অবস্থান খুঁজে নিতে হবে, যে শুভ মঙ্গলময় ক্ষেত্রে নিশ্চিন্তে আমাদের আপন গৃহ তৈরী করতে পারি। সেই মঙ্গলময় ভূমির সন্ধানে যখন বেরোব, তখন দেখব যে আমাদের সেই আপন গৃহের, সেই পরম আনন্দময় সুখনিকেতনের অস্তিত্ব রয়েছে আর সেই সুখনিকেতন হল নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ''এসো, এবার তোমরা নিজেদের বাড়ীতে ফিরে এসো, শ্রীভগবানের কাছে ফিরে এসো, তোমাদের সুন্দর মধুর সুখনিকেতনে ফিরে এসো।'' এই ধরণের একটা আহ্বান, একটা অনুভূতি আমরা নিজেদের ভিতরে উপলব্ধি করব তখনই, যখন সেই চিন্ময় জগতের প্রতিনিধি হয়ে যাঁরা এসেছেন তাঁদের কৃপা পাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হবে। তাঁরা আমাদের হাত ধরে সেই জগতের দিকে নিয়ে যাবেন। তখন আমাদের আপন বাসভূমি কেমন সে সম্বন্ধে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা হবে, সেই জগতের সঙ্গে আমরা একটা ঘনিষ্ঠতা অনুভব করব।

প্রথম প্রথম আমাদের মনে হতে পারে যে আমরা একটা অজানা, অচেনা জায়গায় যাচ্ছি। আমার বর্ত্তমান পরিবেশে চারিদিকে কত অসংখ্য মানুষ, কত প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু যেখানে আমি যেতে চাইছি সে জায়গাটা কেমন আমি জানি না। আমার কাছে সে জায়গাটা যেন কাল্পনিক, ধোঁয়াটে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি আমরা সেইদিকের যাত্রা শুরু করি, তাহলে ক্রমশঃ দেখবো যে সবকিছুর প্রকৃত অস্তিত্ব সেই দিকেই আছে, যে দিকে সবকিছু সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তখন আমরা বুঝব যে এই জড়জগৎ খুবই ক্ষুদ্র ও সীমিত এবং সত্যের কণামাত্র এখানে পাওয়া যায়।

এখানে বাস করে আমরা মনে করতে পারি যে বেশীর ভাগ জীবের অস্তিত্ব এখানেই আছে, কেবল বিশেষ কয়েকজন, যেমন

সক্রেটিস, মহম্মদ বা বুদ্ধ প্রমুখ ব্যক্তিরা সেই মৃত্যুহীন জগতে যান। কিন্তু ক্রমশঃ আমাদের এই উপলব্ধি হবে যে জড়জগতকে আমরা দেখছি তার চেয়ে চিন্ময় জগৎ যে শুধু বৃহত্তর তাই নয়, সে জগৎ অসীম, অনন্ত। ক্রমশঃ আমরা বুঝব যে যেমন কোন দেশে স্বল্পসংখ্যক লোক হাসপাতালে বা জেলখানায় কষ্ট পাচ্ছে, সেইরকম স্বল্প সংখ্যক জীবই দন্ডিত হয়ে এ জগতে কষ্ট পেতে আসে। এই ধারণা যতই স্পষ্ট হবে ততই আমরা সেইদিকে যাত্রা করার উৎসাহ পাবো। নিজেদের বাড়ীর দিকে ছুটে চলার গতিও ততই দ্রুত হবে — "চল এবার বাড়ী যাই, আর দেরী করা নয়।" আর বাড়ী যতই কাছে আসবে ততই আরও জোরে ছুটব, "এই যে এসে গেছে আমার নিজের দেশ!"

বর্ত্তমানে আমরা বহির্জগতে আছি আর আমাদের মনও বহির্মুখী হয়ে আছে। অসহায়ের মত আমরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। শ্রীভগবানের প্রতিনিধিদের কৃপাই আমাদের একমাত্র আশাভরসা। তাঁরা এসে পতিত আমাদের তুলে ধরেন আর সাবধান করে দেন, "কি করছ তোমরা? এদিকে যেও না, এ দেশ বিপদের দেশ, মৃত্যুর দেশ। এসো আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে অমৃতের দেশে নিয়ে যাবো।" ভগবানের এই প্রতিনিধিরা আসেন আমাদের ঘুম থেকে তুলে দেওয়ার জন্যে, আমাদের তামসিক উন্মত্ততার ঘোর কাটিয়ে দেওয়ার জন্যে। তাঁরাই হলেন বৈষ্ণব আর শাস্ত্রও তাঁরাই দিয়েছেন, যে শাস্ত্র সেই অন্য জগতের কিছু ইতিহাস, কিছু বিবরণ আমাদের দিয়েছে আর যে সাধুরা সেখানে গেছেন তাঁদের কথাও বলেছে। শাস্ত্রের সাহায্যে আমাদের শ্রদ্ধা আরও উন্নত হবে এবং আমরা আরও বেশী সাধুসঙ্গে থাকবো। এইভাবে আমাদের দ্রুত উন্নতি হবে।

সত্যিকারের উন্নতি হচ্ছে কি না হচ্ছে তা বোঝার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পন্থা হচ্ছে নিজেরই "হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো" — সাধক নিজের হৃদয় থেকেই এই সমর্থন পাবেন যে, হ্যাঁ তাঁর সত্যিকারের উন্নতি হচ্ছে। তা নাহলে তো যে কোন মানুষকে ভুলিয়ে ভালিয়ে যে কোনদিকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে আর পরিণামে কিছুদিন পরে তাঁকে পস্তাতে হবে। কিন্তু সেইরকমের একটা লেনদেনের মধ্যে কোন যথার্থতা নেই, তা হল অসত্য, ফাঁকি, ধাপ্পাবাজি। ধর্ম্মের নামে এইরকম কত কিনা

চলে, এ যেন একটা ব্যবসা। কিন্তু তার মানে এই নয় যে প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি বলে কিছু নেই, প্রকৃত মুক্তি বলে কিছু নেই। ‘‘হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো’’— সেই হল চরম প্রমাণ যখন নিজের হৃদয় থেকে সমর্থন আসবে যে ‘‘হ্যাঁ, এই হল সেই সত্য বস্তু যা আমি চাই। আমার হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে এর জন্য উল্লসিত সমর্থন আসছে। আর আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করছে এই ভেবে যে এমন উজ্জ্বল, অমৃতময় সম্ভাবনা আমার আছে।’’

তৃতীয় অধ্যায়

যথার্থ জিজ্ঞাসা ও যথার্থ প্রচেষ্টা

সাধারণতঃ এই পৃথিবীতে আমাদের ভূমিকা হল এই যে আমরা কর্ম্মী। আমরা হলাম সেই ধরণের মানুষ যারা প্রকৃতিকে ও নিজেদের পারিপার্শ্বিককে শোষণ করছে নিজেদের জন্য ক্ষমতা ও শক্তি সঞ্চয় করার জন্যে। সর্ব্বদাই আমাদের প্রচেষ্টা যতটা সম্ভব শক্তি সঞ্চয় করা যাতে আমাদের দরকার মত এই শক্তিকে আমরা কাজে লাগাতে পারি, যাতে আমাদের সব চাহিদা মেটে, সব প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। শুধু তাই নয় ভবিষ্যতের জন্যও আমরা সঞ্চয় করতে চাই। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে এই সংসারে আমরা যারা বাস করছি আমাদের প্রকৃতি হল এইরকম। আর যদি কোন সময়ে এই শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টার পথে কোন বাধা আসে তাহলে আমরা মনে করি সেটা খুবই খারাপ অবস্থা। কারণ আমাদের জীবনে লক্ষ্যের পথে তা বাধা সৃষ্টি করছে। কেন না আমাদের জীবনের লক্ষ্যই হল যথাসম্ভব শক্তি বা ধন সঞ্চয় করা। তবুও আমাদের আভ্যন্তরীণ ঐশ্বর্য্যের কি মূল্য সেটা যাতে আমরা মনে রাখি তাই আমাদের এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে বহির্জগৎ আমাদের তত ক্ষতি করতে পারে না, যত ক্ষতি করতে পারে আমাদের নিজেদের প্রকৃতি। আমাদের নিজেদের প্রকৃতিই আমাদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করবে, যখন আত্মার জগতে আমাদের যে যথার্থ অস্তিত্ব আছে সেই যথার্থ অস্তিত্বের জন্য ধনসংগ্রহে আমরা অবহেলা করব। এই কথাটা আমাদের বুঝতে হবে ও মনে রাখতে হবে। বহির্জগৎ থেকে যা আসছে তা অত গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ তা কেবল আসে আর যায়। এমন কি এই যে শরীরটা যা বর্ত্তমানে আমাদের সমস্ত চিন্তার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে তাও একদিন অদৃশ্য হয়ে যাবে। সুতরাং এই শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত যা

কিছু, তাদের চাহিদা মেটাবার জন্যে এত সঞ্চয় করার কি কোন প্রয়োজন আছে? আমার আত্মার ভিতরে যে প্রকৃত আমি আছি তাকে জাগিয়ে তোলাই আমার প্রয়োজন। তাকেই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে এবং তার জন্যেই সাহায্য চাইতে হবে। এই ধরণের একটা চেতনার আন্দোলন শুধু সাধুর সঙ্গে যোগাযোগ হলেই সম্ভব হয়। যে দিন কোন সাধুর দর্শন পাব না, যে দিন আমার জীবনের প্রকৃত অর্থ কি, প্রকৃত তত্ত্ব কি তা নিয়ে কোন আলোচনা শুনব না, সেই দিনটাই বৃথা গেল মনে করতে হবে। এ সম্বন্ধে আমাদের সর্ব্বদা সচেতন থাকতে হবে। আমার ভিতরে যে প্রকৃত আমি আছি তাকে যেন আমি যে কোন উপায়ে মনে রাখি, যেন সর্বরকমে মনে রাখি। আমার প্রকৃত স্বরূপকে খুঁজে বার করে আমি যেন আমার প্রকৃত স্বার্থ সিদ্ধ করি। বহির্জগৎ এবং বাহ্যিক পরিবেশ স্বম্বন্ধে উদাসীন হয়ে অন্তরে যে সত্য আছে, যে ঐশ্বর্য্য আছে তাঁর মধ্যে আমাকে ডুব দিতে হবে। আমার অন্তর্নিহিত সত্ত্বাকে খুঁজে বার করতে হবে, খুঁজে বার করতে হবে সেই জগৎকে যেখানে আমার অন্তর্নিহিত সত্ত্বা বাস করে। আমার সেই ঘর কোথায় আছে, কোথায় আছে আমার সেই সুখনিকেতন, তা আমাকে খুঁজে বার করতে হবে। যেন আমি ফিরে যেতে পারি আমার ঘরে, ফিরে যেতে পারি শ্রীভগবানের কাছে। সেই ঘরে ফিরে যাবার জন্যেই আমাকে সব শক্তি সঞ্চয় করতে হবে, এই প্রবাসে, এই মৃত্যুর দেশে বিচরণ করে বেড়াবার জন্যে নয়। যে কোন মূল্যে এই মৃত্যুর দেশকে ত্যাগ করতে হবে এবং সর্ব্বদা সেই চিরন্তন; নিত্যভূমির সন্ধানে থাকতে হবে। আমি যে সেই শাশ্বতভূমিরই বাসিন্দা তা আমাকে বুঝতে হবে। আমাকে বুঝতে হবে কোথায় আমার ঘর আর কেনই বা তাই আমার নিজের ঘর। ''সুখনিকেতন'' এর অর্থ কি? এর অর্থ হল যেখানে থাকার আমার জন্মগত অধিকার আছে আমার সেই প্রকৃত বাসভূমি, আমার সেই আপন গৃহ। আমরা যে এখন আমাদের নিজের ঘরে নেই — সেই সত্যের সম্মুখীন আমাদের হতে হবে, এই সত্যকে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু সেই নিজের ঘরকে খুঁজে পাওয়ার জন্যে একটা ব্যাকুলতা যদি আমাদের ভিতরে থাকে, তবে বুঝতে হবে আমরা বড় ভাগ্যবান।

অন্তরে যে তৃষ্ণা আছে সেই তৃষ্ণা কেমন করে মেটাবো সেইটে

জানাই হল সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। আমাদের উপলব্ধি যেন এইরকম হয় যে, "এই সংসার এখানে আর আমিও এখানে, কিন্তু এখানে আমার কোন সুখ নেই, সন্তোষ নেই। কি করলে আমার অন্তর্নিহিত সত্ত্বা সুখী হতে পারে?" আমরা অভাবের মধ্যে আছি, অতএব কি সেই পদ্ধতি যার দ্বারা এই অভাব দূর হতে পারে? বর্ত্তমানে আমাদের একটা রক্তমাংসের শরীর আছে, কিন্তু সেই শরীরের সমস্ত খুঁটিনাটি, হাড়গোড়, রক্তমাংস, স্নায়ুতন্ত্র, এসব সম্বন্ধে বিশদভাবে জানার প্রয়োজন নেই। শরীরের মধ্যে যে রক্ত আছে তাঁর প্রকৃতি, গঠন, মিশ্রণ এসব বিশদভাবে জানার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের সমস্ত প্রশ্ন, কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা যেন সেইদিকে ধাবিত হয় যেদিকের একমাত্র প্রশ্ন হল, "কে আমি? কেন এখানে আমি কষ্ট পাচ্ছি? কেমন করে আমি জানব আমার এই সমস্যার সমাধান কিসে হবে?" এই হল আমাদের মুখ্য প্রশ্ন আর এই নিয়েই আমাদের চিন্তিত থাকা উচিত।

"অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" — এখন এই মানব জন্মে, সেই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার সময় হয়েছে, যে জিজ্ঞাসার উত্তর পেলে আমি নিজেকে জানতে পারব। এখন থেকে এই হবে আমার প্রশ্ন — "কোথা থেকে আমি এলাম? কেনই বা আর কি করে এখানে আমি বেঁচে আছি? আমার ভবিষ্যৎ কি?" এই মুখ্য প্রশ্নই এখন আমাদের চিন্তার বিষয় আর আমাদের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে এর উত্তর পেতে হবে। এ কেবল আমার প্রশ্ন নয়, এ কেবল একজনের প্রশ্ন নয়, সমস্ত সৃষ্টির এই প্রশ্ন। সেই হবে যথার্থ প্রশ্ন যখন আমরা সবকিছুর উৎসকে বা আদি কারণকে জানার চেষ্টা করব। তা না হলে শুধু এটা জানা, ওটা জানা, অন্য হাজার জিনিসকে জানার চেষ্টা করা শুধু শক্তির অপচয়। শাস্ত্রীয় অনুসন্ধিৎসার প্রকৃতিই হল এইরকম যে সেখানে প্রশ্ন হল "কোথা থেকে আমি এলাম? কে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে? আমার ভবিষ্যৎ কি? কেন আমি এখানে স্বস্তি পাচ্ছি না? আরাম পাচ্ছি না? কেমন করে আমার তৃষ্ণা মিটবে আর আমার ভিতরে আমি পরিপূর্ণতা লাভ করব?" সমস্ত প্রশ্ন, সমস্ত কৌতূহল যেন এইদিকে যায়। তা না হলে অযথা কৌতূহল আমাদের একটা রোগ হয়ে দাঁড়াবে। একের পর এক কৌতূহল মনের মধ্যে মাথা চাঁড়া দেবে, যার আর কোন শেষ নেই। তাই আমাদের

জানা প্রয়োজন কি প্রশ্ন করতে হবে, আর কোথায় কেমন করে সেই প্রশ্ন জানাতে হবে। তবেই যে শক্তি আমরা ক্ষয় করব তার একটা মূল্য থাকবে, তার অপচয় হবে না।

সেই অনুসন্ধিৎসাই হল প্রকৃত অনুসন্ধিৎসা যা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং আমাদের সমস্ত শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সেইদিকেই নিয়োগ করতে হবে। এ হল কলিযুগ, তর্ক, বিবাদ, কলহের যুগ। এখন আমাদের একমাত্র সত্যিকারের প্রয়োজন হল সেই সাধুদের সাহায্য নেওয়া যাঁদের জীবন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর প্রয়োজন হল শ্রীভগবানের দিব্যনাম জপ করা — ''সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম।'' এই পথ থেকে যদি আমরা বিচ্যুত হই তবে প্রত্যেক পদেই ভুল নির্দ্দেশ পাবো।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সব উপদেশের সারবস্তু আমাদের দিয়ে গেছেন আর অনর্থ নিবৃত্তির জন্য এর চেয়ে ভাল সাহায্য আর কিছু নেই।

মহাপ্রভু বলেছেন বিনা সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম জপ করলে আমাদের সাধনপথে অগ্রসর হওয়া খুব কঠিন হবে। তাই এককথায় সাধুসঙ্গই হল সব সমস্যার সমাধান। তাই শাস্ত্রের মান অনুযায়ী যাঁর ভগবৎ উপলব্ধি হয়েছে এমন সাধুর পাদপদ্মে যদি আমরা আশ্রয় পাই তখন আমাদের সাধনপথে, সব কিছুই ঠিক ঠিক চলবে। আর সাধুদের রাজাধিরাজ হলেন শ্রীগুরুদেব। যিনি সজ্জনদের রাজাধিরাজ সেই গুরুদেবই আমাদের ঠিক পথে চালিত করবেন, আমাদের নির্দ্দেশ দেবেন। যিনি গুরু হবেন তিনি নিশ্চয়ই আমাদের এমনভাবে চালিত করবেন, এমনভাবে নির্দ্দেশ দেবেন যাতে আমাদের সব প্রয়োজন সিদ্ধ হবে ও আমাদের পরিপূর্ণ সন্তোষ আসবে। তা না হলে আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে কাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি আর কার কাছেই বা আমরা সম্পূর্ণরূপে আত্মসর্মপণ করতে পারি? গুরুর কাছেই আমাদের সব অনুসন্ধিৎসার সর্ব্বোচ্চ

প্রয়োজন মিটবে ও তাঁর সম্পূর্ণ তৃপ্তি হবে। তাঁর ভিতর দিয়েই উপরের জগৎ থেকে নির্দ্দেশ আসবে। এক ক্রমবিকশিত প্রেমভক্তির জগতের নির্দ্দেশ সেখান থেকেই আসবে। সেই সূক্ষ্মতম দিব্য তরঙ্গের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করতে হবে, তবেই আমাদের সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল হবে। এই হল যথার্থ ধারণা।

পরিণতিতে, আমাদের সবসময়ই চেষ্টা করা উচিত যে যাঁরা উচ্চতর জগতের উচ্চতর উপলব্ধির অধিকারী, সেই উচ্চতর প্রতিনিধিদের আনুগত্যে যেন আমরা থাকতে পারি। এইভাবেই আমরা জীবনের সূক্ষ্ম ও উচ্চস্তরে পৌঁছাতে পারব। জীবনে নানা স্বার্থের নানা তরঙ্গ আছে, নানারকমের লাভক্ষতি এখানে আছে, কিন্তু যা সর্ব্বোচ্চ তার সঙ্গে যোগাযোগ করাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য।

এটা যেন আমরা বুঝি যে এই সাংসারিক জীবনে কোন মাধুর্য্য নেই। এখানে সবকিছু যে শুধু চর্ব্বিতচর্ব্বন বা বাসী, সে অভিজ্ঞতা তো ইতিমধ্যেই আমাদের ভালভাবেই হয়েছে। তাছাড়া যেখানে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, এই চার শত্রু রয়েছে সেখানে তো সত্যিকারের সুখ থাকতেই পারে না। যেখানেই মৃত্যু আছে সেখানেই কোন সুখ নেই। এইরকম জীবনের স্তরে আমরা সবসময়ে মৃত্যুভয়ে তাড়িত হচ্ছি, তাই এইরকম জীবনে কোন মাধুর্য্য নেই; সব মাধুর্য্য এই মৃত্যুভয়ে একদম বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাই খুব আগ্রহের সঙ্গে, ব্যাকুলতার সঙ্গে আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে সেই জায়গায়, যেখানে আমরা চিরকাল বেঁচে থাকতে পারব। একটা উচ্চতর বাসভূমি খুঁজে পেতে হবে, যেখানে আমরা সত্যিসত্যিই বাঁচতে পারি।

যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।।
(শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা, ১৫/৬)

অর্থাৎ "শরণাগত ভক্তগণ যে স্থান প্রাপ্ত হয়ে সেখান থেকে আর প্রত্যাবর্তন করেন না — তাই আমার পরম ধাম।" শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্‌গীতায় বলছেন "যে স্থানে গিয়ে কেউ আর এই মৃত্যুলোকে ফিরে আসে না সেই স্থানই হল আমার পরমধাম।"

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।।
(ভগবদ্‌গীতা ৮/১৬)

অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক থেকে আরম্ভ করে অধস্তন সমস্ত লোক অথবা লোকবাসী জীবগণই পুনরাবৃত্তিশীল, কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হলে পুনরায় জন্ম হয় না।" শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই উপদেশ দিচ্ছেন যে "একটা নিত্য জীবন শুধু আমার পরম ধামেই থাকতে পারে। এখানকার সমস্ত বৃত্তি, এমন কি রাজার আসনও, স্বপ্নের মত ক্ষনস্থায়ী। সুতরাং তুমি যদি এই স্বপ্নের মত ক্ষণিক জীবন থেকে নিস্কৃতি চাও আর সত্যের জগতে প্রবেশ করতে চাও তবে নিজেকে উন্নত করে সেই স্তরে নিয়ে যাও যেখানে তুমি সেই চিন্ময় ধামের, সেই বাস্তব জগতের সন্ধান পাবে। যথা সূক্ষ্ম, অচিন্ত্যনীয়ই হোক না কেন সেই জীবনের স্তর, তবু সেখানেই যাওয়ার চেষ্টা কর, কারণ মৃত্যু তাকে কখনও গ্রাস করবে না। সমস্ত শক্তি একত্রিত করে স্থায়ী কিছু গড়ে তোলার চেষ্টা কর। বর্ত্তমানে তুমি তোমার শক্তি নিয়োগ করছ এমন কিছুতে যা পর মুহুর্তেই ধ্বংস হয়ে যাবে — এমন চেষ্টা কেবল মূর্খতা।"

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।।

(শ্রীমদভগবদ্‌গীতা ৬/৫)

অর্থাৎ "বিষয়ে অনাসক্ত মন দ্বারা জীবাত্মাকে সংসারকূপ থেকে উদ্ধার করবে, কখনও বিষয়াসক্ত মন দ্বারা জীবাত্মাকে সংসারে পতিত করবে না। যেহেতু মনই জীবের বন্ধু এবং অবস্থাভেদে আবার সেই মনই শত্রু হয়ে থাকে।" শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন যে "একথা মনে রেখো যে তুমিই তোমার বন্ধু। কিন্তু তুমি তোমার শত্রুও বটে। যদি তোমার সত্যিকারের উন্নতির জন্য তুমি যত্ন না নাও তবে তুমি নিশ্চয়ই তোমার শত্রু। কিন্তু তুমি তোমার নিজের বন্ধুও হতে পার আর তুমি তোমাকে যত সাহায্য করতে পার এত সাহায্য অন্য কেউ তোমাকে করতে পারে না।"

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ।।
(শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ৬/৬)

অর্থাৎ যে জীব নিজের মনকে জয় করেছেন, তার সেই মনই বন্ধু অর্থাৎ বন্ধুর মত হিতকারী; কিন্তু অজিতমনা ব্যক্তির সেই মনই শত্রুর ন্যায় সর্ব্বদা অপকারে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে।" শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন যে "যদি তোমার কোন আত্মসংযম থাকে তবে তোমার সমস্ত শক্তি একত্রিত করে তাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত কর যাতে সে বিপথগামী না হয়। তোমার শক্তিকে এমন দিকে চালিত কর যেদিকে তুমি প্রকৃত সমৃদ্ধি, প্রকৃত সাফল্য লাভ করবে। তবেই তুমি তোমার সত্যিকারের বন্ধু হবে। কিন্তু যদি তুমি তোমার সত্ত্বাকে যে নিম্নপ্রকৃতি কেবল শোষণ, কর্ম্মফল ও দুঃখের জগতে বিচরণ করে, সেই নিম্নপ্রকৃতির দ্বারা বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত হতে দাও, তবে তুমি অবশ্যই তোমার শত্রু। এইসব বিষয় নিয়ে ভাল করে চিন্তা করে দেখ।"

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদগুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেন যথেচ্ছসি তথা কুরু।।
(শ্রীমদভগবদ্‌গীতা ১৮/৬৩)

অর্থাৎ "তোমাকে এই গূঢ় থেকেও গূঢ়তর জ্ঞানের কথা আমি বললাম। একথা অশেষভাবে পর্য্যালোচনা করে তোমার যা ইচ্ছা তাই কর।" শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন "আমি তোমাকে যা বললাম তা খুব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ। তারপর তোমার যা ভাল মনে হয় তাই কর। এই মানবজীবন বড় মূল্যবান। এখন তোমার বিচার করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু যদি তুমি কর্ম্মফলের তরঙ্গে ভেসে যাও তবে তোমার সেই বিচার করার শক্তি কেড়ে নেওয়া হবে এবং তখন তোমাকে কোন গাছপালা বা জীবজন্তুর দেহে জন্ম নিতে হবে। তুমি কি নিশ্চিত হয়ে বলতে পার যে তোমার এমন অধোগতি হবে না যে পরের জন্মে তোমার পশুজন্ম হবে না? এমন আশ্বাস তুমি কোথায় পেয়েছো?"

এমন নয় যে সমস্ত কর্ম্ম শুধু মৃত্যুর জগতেই সম্পন্ন হয়, সমস্ত প্রগতি শুধু মৃত্যুর জগতেই হয়। শুধু অন্ধকার আর অজ্ঞানতার জগতেই

প্রগতি সীমাবদ্ধ নয়। যখন তুমি সেই অন্য জগতের অমৃতময় প্রগতির পথে পা বাড়াবে তখন তুমি বুঝবে যে সেই হল সত্যিকারের প্রগতি।

ভিতরের সমর্থন থেকে, তোমার হৃদয়ের সমর্থন থেকেই তোমার যথার্থ প্রগতিকে তুমি অনুভব করবে ও তাকে বুঝতে পারবে। এমন নয় যে তোমাকে কোন মিথ্যে আশা দেওয়া হয়েছে আর এক অজানা জায়গায় নিয়ে গিয়ে সেখানে তোমাকে অত্যাচার করা হবে বা তোমার উপর অবিচার করা হবে বা তোমাকে খুন করা হবে। তার কোন প্রশ্নই ওঠে না, সেরকম চিন্তাও করা উচিত নয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে বলা হয়েছে —

ভক্তিঃ পরেশানুভ্‌বঃ বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপাদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্‌।।
(শ্রীমদ্‌ভাগবতম্‌ ১১/২/৪২)

অর্থাৎ, ''সুপথ্য অন্ন ভোজনকারীর প্রতিগ্রাসে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি ক্রমশঃ হয়ে থাকে, সেইরকম প্রসন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই ভক্তি, পরেশানুভবরূপ সম্বন্ধজ্ঞান, এবং অনিত্যবস্তু ও ব্যক্তিতে বিরক্তি এককালে হয়। তাৎপর্য্য এই যে যিনি শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করেন, তাঁর হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান এবং ইতর বস্তুতে বিরক্তি একই কালে হয়। জ্ঞান বৈরাগ্য পৃথক তত্ত্ব নয়, সুতরাং তাদের চেষ্টা পৃথক হলে তারা বহির্মুখ হয়। বহির্মুখ জ্ঞান ও শুষ্কবৈরাগ্য খুবই মন্দ। ভক্তিজনিত সম্বন্ধজ্ঞান ও ইতর বৈরাগ্য স্বয়ং উৎপন্ন হয়ে থাকে। যে স্থলে তারা উৎপন্ন হয় না, সে স্থলে ভক্তির অভাব। সুতরাং তাকে কপট ভক্তি বলতে হবে। বৈরাগ্য আত্মার তুষ্টি, সম্বন্ধজ্ঞানে আত্মার পুষ্টি এবং ভক্তিক্রিয়ায় ক্ষুন্নিবৃত্তি, এইরকম তিনটি উপমা প্রদর্শিত হল।'' শ্রীমদভাগবতমের এই বিখ্যাত শ্লোকে এই তত্ত্বটিই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে যখন আমরা কিছু খাই, তখন আমাদের পাকস্থলীই তার সাক্ষী থাকে, সেখানেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতি গ্রাসেই সে বলবে, ''হ্যাঁ, আমি খাচ্ছি বটে।'' ক্ষুধার তুষ্টি হবে, শরীরের পুষ্টি হবে এবং খাওয়ার যে তৃপ্তি তাও হবে। শরীর পুষ্ট হয়ে বল, বীর্য্য, শক্তি পাবে এবং নিজের ভিতর থেকেও একটা পরিতৃপ্তি অনুভব করা যাবে। শুধু তাই নয়, ক্ষুধার তুষ্টি হওয়ার জন্যে আরও খাওয়ার প্রয়োজন আর থাকবে না। সেইরকম একইভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে,

ভক্তি অনুশীলন কালে, বহুরকমের লক্ষণ আমরা দেখতে পাবো যার দ্বারা আমাদের প্রগতির প্রমাণ পাওয়া যাবে।

এখন আমরা এই মানবদেহ ধারণ করেছি; তাই আমাদের পক্ষে এ বড় অমূল্য সময়, অথচ এই সময়ের অপচয় হচ্ছে। আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান শক্তি আমরা অকাজে ব্যবহার করে নষ্ট করছি। শাস্ত্র তাই বলছেন, "উত্তিষ্ঠিতঃ, জাগ্রতঃ, প্রাপ্য বরাণ নিবোধতঃ" — "তাই ওঠ, জাগ, সেই অমৃতময় জীবনের পথে শুধু নিজেকে নিয়োজিত কোর না, অন্যদেরও ডেকে নাও। অপরকে সাহায্য করলে, অপরের সঙ্গে যোগযুক্ত হলে তুমিও তাদের কাছ থেকে কোন বিশেষ সাহায্য পাবে।"

আসল কথা হল এই যে কোন উত্তম অধিকারীর আনুগত্যে থেকে আমাদের নিজেদের সেবার কাজে, ভক্তি অনুশীলনের কাজে নিয়োজিত করতে হবে। এই সেবার জীবনে, সেবার কাজে আমরা যেন এতই ব্যস্ত থাকি যে যা কিছু তুচ্ছ ও জড়, তার জন্যে যেন আমাদের কোন সময় না থাকে। বৈষ্ণবসঙ্গে থেকে এইরকম পরিপূর্ণ সেবার জীবন আমাদের পক্ষে খুবই মঙ্গলময় হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

সুবর্ণ সুযোগ

আভ্যন্তরীণ আত্মতুষ্টি বা হৃদয়ের সন্তোষ, যা থাকলে এই দুঃখময় জগতের বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিককে উপেক্ষা করা যায়, তা এক অমূল্য সম্পদ। আত্মার জগতের কাছাকাছি এলেই তা পাওয়া যায়।

প্রকৃত ভক্তি হল অহৈতুকী, ভক্তিই ভক্তির কারণ। ভক্তি অন্য কিছু থেকে আসে না, সে নিজেই নিজের কারণ। যেমন হেগেল বলেছেন সত্য নিজেই নিজের কারণ। কিন্তু সত্য কোন অস্পষ্ট বস্তু নয়, সত্য হল এমন এক তত্ত্ব যার অস্তিত্ব তার নিজের জন্যেই আছে। তা হল অনাদি এবং অহৈতুকী। তা হল নিত্য এবং অন্য কিছু তাকে সৃষ্টি করতে পারে না। ভক্তি থেকেই ভক্তির সৃষ্টি। আমাদের সাহায্য করার জন্যে ভক্তির এইসব সংজ্ঞা আমাদের দেওয়া হয়েছে, যাতে আমরা খানিকটা বুঝতে পারি যে ভক্তি কি বস্তু। অন্য কিছু ভক্তিকে সৃষ্টি করেনি আর ভক্তির অস্তিত্ব নিত্যকালই রয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের ভক্তি ঢাকা পড়ে আছে, সেই ঢাকা খুলে তাকে আবার নতুন করে আবিস্কার করতে হবে। এখন সে এক সম্ভাবনার বীজ রূপে রয়েছে। বাইরে থেকে সাহায্য পেলেই সে ক্রমবিকশিত হয়ে উন্মোচিত হবে। এখন যেন সে ঘুমিয়ে আছে, তাকে ঘুম থেকে তুলে দিতে হবে। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, চঞ্চল মনের নানা বাসনা, ভোগ ও ত্যাগের ইচ্ছা, জীবনের পরম লক্ষ্যের প্রতি উপেক্ষা — এসবই ভক্তিকে ঢেকে রেখেছে। যদি এসব ঢাকা সরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ভক্তি আবার তার নিত্যনির্ম্মলরূপে, তার স্বমহিমায় প্রকাশিত হবে।

এই উচ্চতর সত্যের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকা, এর প্রতি আকর্ষণ ও নিষ্ঠা থাকা এ জগতে খুব বিরল। বিশেষতঃ এই বর্ত্তমান যুগে যখন সমস্ত চিন্তাধারা, এমনকি জ্ঞানও শোষণের দিকে যাচ্ছে। জ্ঞান যে এখন শোষণ প্রবৃত্তির দাসত্ব করছে এতেই এ জগতের সর্ব্বনাশ হচ্ছে। আনবিক শক্তি ও এইরকম নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখন এক বিরাট আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোন মূহুর্ত্তে এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদের এমন এক অবস্থায় এনে ফেলেছে যে, যে কোন মূহুর্ত্তে সবকিছুই এখানে শেষ হয়ে যেতে পারে। এইরকম জ্ঞান তো আত্মহননকারী। জগতে এইরকম জ্ঞানের বৃদ্ধি হওয়ার ফল হল এই যে পরিণামে আমরা আত্মহত্যার পথে পা বাড়াচ্ছি। শোষণ থাকলেই তার প্রতিক্রিয়া থাকবে। তাই আমরা যদি সকলে সার্ব্বজনীন শোষণের পথকে গ্রহণ করি তবে তার ফল হল প্রলয়, মহাপ্রলয় বা ধ্বংস। যে কোনভাবেই হোক, তা সে অ্যাটম বোমার দ্বারাই হোক বা কোন প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের দ্বারাই হোক, প্রলয় অবশ্যই আসবে, তারপর আবার সৃষ্টি হবে এই জগৎ; জন্ম আর মৃত্যু, জন্ম আর মৃত্যু — এই চক্র চলতেই থাকবে। প্রত্যেক জীবের আবার জন্ম হবে আবার মৃত্যু হবে আর এই সৌর জগতেরও আবার সৃষ্টি হবে আবার ধ্বংস হবে, নিরবধি কাল ধরে।

এই বেড়াজাল থেকে যদি আমরা বেরোতে চাই, তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার জগৎকে আমাদের ত্যাগ করতে হবে। ভগবদ্ গীতায় বলা হয়েছে, এবং উপনিষদেও এর উল্লেখ আছে যে—

ইন্দ্রিয়াণি পরানি আহুঃ
(শ্রীমদভগবদ্গীতা ৩/৪২)

অর্থাৎ পন্ডিতগণ বলেন জড় বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ। আমাদের ইন্দ্রিয়রাই এখানে মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে, কারণ যদি চোখ, কান, নাক, স্পর্শ অনুভূতি এসব আমাদের চলে যায় তবে এই জগৎটাই আমাদের কাছ থেকে সরে যাবে। আমাদের এই ইন্দ্রিয়গুলো আছে বলেই এই অভিজ্ঞতার জগৎও আছে। সুতরাং অভিজ্ঞতার জগতে ইন্দ্রিয়ের স্থানই প্রধান। তারপর বলা হয়েছে —

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ

(শ্রীমদভগবদ্গীতা ৩/৪২)

অর্থাৎ সর্ব্ব ইন্দ্রিয় থেকে মন শ্রেষ্ঠ। আর কি এই মনের স্বরূপ? এ হচ্ছে আমাদের নির্ব্বাচনের বা সঙ্কল্প বিকল্পের প্রবৃত্তি। মন কেবলই বলবে, "আমি এটা চাই, আমি ওটা চাই না।" কোন কোন জিনিস মন পছন্দ করে আর কোন কোন জিনিস মন অপছন্দ করে, এই হল মনের ধর্ম্ম। মনের স্থান ইন্দ্রিয়ের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমি যদি অন্যমনস্ক থাকি আর একজন যদি আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যায় তখন আমার পক্ষে এরকম বলা সম্ভব "কই! আমি তো তাকে দেখিনি, তার কথা শুনতে পাইনি। আমি যে অন্যমনস্ক ছিলাম।" সুতরাং অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে আছে মন আর তাই সে ইন্দ্রিয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। জড়জগতের চেয়ে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ আর ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ মন যদি কোন অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ না করে তবে ইন্দ্রিয়রা, যারা মনের দরজার মত, তারা সব অকেজো হয়ে যাবে। তারপর বলা হয়েছে ভগবদ্গীতায়—

মনসস্তুপরা বুদ্ধি

(শ্রীমদভগবদ্ গীতা ৩/৪২)

অর্থাৎ মন অপেক্ষাও নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিরূপ বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। আমাদের ভিতরে আরও একটি সূক্ষ্ম বৃত্তি আছে যাকে বলা হয় যুক্তি বা বুদ্ধি, আর কি তার ধর্ম্ম? মন যখন বলবে, "আমি এটা চাই, এইটা আমি নেব" বুদ্ধি তখন বলবে, "না না! তুমি এটা নিও না, এতে তোমার ক্ষতি হবে। বরং তুমি ওইটা নাও, ওতে তোমার মঙ্গল হবে।" এই যে বিচারশক্তি বা নির্ব্বাচনের ক্ষমতা, এ আমাদের মনের চেয়ে এক উচ্চতর বৃত্তি। তারপর বলা হয়েছে ভাগবতগীতায় যে,

বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ।।

(শ্রীমদভগবদ্ গীতা ৩/৪২)

অর্থাৎ আবার যিনি বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তিনিই সেই (জীবাত্মা)। এইভাবে আমাদের ভিতরে উপাদানগুলোকে আমরা একে একে খুঁজে নিতে পারি। জড়জগতের চেয়ে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ,

মনের চেয়েবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ,কারণবুদ্ধিবৃত্তিমনের চেয়ে বেশীসূক্ষ্মওনির্ভরযোগ্য; আর ''বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ'', বুদ্ধিরও উপরে কিছু আছে, সে হল আমাদের আত্মা। আর কি তার প্রকৃতি, কি তার বৈশিষ্ট্য? সে হল আলোর মত।

শাস্ত্রে একটি উপমা দেওয়া হয়েছে যে চন্দ্রালোকিত রাত্রে হয়ত আকাশে মেঘ থাকতে পারে যে মেঘ চাঁদকে ঢেকে রেখেছে, কিন্তু সেই মেঘকেও দেখা যাচ্ছে সেই চাঁদেরই আলোতে। বেদ প্রণেতা শ্রীল ব্যাসদেব বলেছেন যে আত্মা হল এই দ্যুতিময় চন্দ্রের মত। অথবা আত্মা হল সূর্যের মত। একটি মেঘ এসে যদি সূর্যকে ঢেকেও দেয় তবু সেই মেঘকেও দেখা যাচ্ছে সেই সূর্যেরই আলোতে। সেইরকম আত্মাও হল আমাদের ভিতরে এক আলোকবিন্দু; আর পটভূমিকায় সেই আলোকবিন্দু আছে বলেই, সেই অনুচেতনা আছে বলেই আমাদের মনের জগৎকে আমরা অনুভব করতে পারি। সেই আলোকে যদি সরিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে। মনের জগৎ, বুদ্ধিবৃত্তি বা বিচারশক্তি, আর জ্ঞান অর্জ্জনের বিভিন্ন প্রণালী — এ সবেরই কোন মূল্য থাকবে না যখন এই আলোকে সরিয়ে নেওয়া হবে। এই আলোই হল আত্মা। সে এক আলোকবিন্দু যা এই জগতের আর সব কিছু থেকে বিশেষভাবে পৃথক। আত্মা হল এক আলোর বিন্দু; এক অনুচেতনা এবং এক জ্যোতির্ম্ময় জগৎ আছে যা শুধু চেতনা দিয়েই তৈরী, আত্মা দিয়ে তৈরী, এমনি করে আবার এক ক্রমবিকাশ আছে; আত্মা থেকে পরমাত্মার দিকে যাত্রা। যেমন এই জড়জগতে আমরা দেখি আকাশ, হাওয়া, তাপ, জল, তারপর মাটি, পাথর — এইভাবে এই জড় অস্তিত্বের মধ্যে একটা ক্রমবিকাশ আছে, সেইরকম সূক্ষ্মতর জগতেও একটা ক্রমবিকাশ আছে; বুদ্ধি থেকে আত্মা, আত্মা থেকে পরমাত্মা, সেখান থেকে স্বয়ং ভগবান। এইভাবে আধ্যাত্মিক জগতের ক্রমবিকাশ অনন্তের দিকে প্রসারিত হয়। এ হল পরমার্থ তত্ত্ব।

যাঁরা অভিব্যক্তি বাদে (theory of evolution) বিশ্বাস করেন, যে অভিব্যক্তি বা বিবর্ত্তন বাদ শুরু হয়েছিল ডারউইন থেকে, তাঁরা বলেন যে সবকিছু এসেছে জড়বস্তু থেকে। তাঁরা বলেন এমনকি গর্ভের মধ্যেও প্রথমে একটা জড়বস্তু থাকে যেটা ক্রমশঃ বেড়ে ওঠে এবং সেই জড়বস্তু বেড়ে ওঠে বলে ক্রমশঃ জ্ঞানও বেড়ে ওঠে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে তাঁরা মনে করেন যে চেতনা এসেছে বস্তু থেকে। কিন্তু যাঁরা শাস্ত্রের

অনুগামী তাঁরা সেকথা মানেন না। তাঁরা বলেন চেতনাই সর্ব্বেসর্ব্বা আর সবকিছু সেই চেতনার সমুদ্রে ভাসছে। এ হল আত্মিক অভিব্যক্তিবাদ বা চেতনার বিবর্ত্তন তত্ত্ব। ডারউইন এর অনুগামীরা জড় বিবর্ত্তনের কথা বলেছেন আর বৈদিক শাস্ত্র বলছেন যে সবকিছুই আত্মিক বিবর্ত্তন বা চেতনার বিবর্ত্তনের আওতায় আসে। যেমন বিশপ বার্কলে বলে একজন ইউরোপীয় দার্শনিক বলেছেন, "এমন নয় যে মনটা জগতের মধ্যে আছে, বরং জগৎটাই মনের মধ্যে আছে।"

যাঁরা অভিব্যক্তিবাদের বিশ্বাস করেন তাঁরা বলেন শুরুতে ছিল জড়বস্তু। কিন্তু প্রশ্ন হল এই জড়বস্তু কি? জড়বস্তুও তো একটা বিশেষ ধারণা এবং তা চেতনারই অন্তর্গত, তা চেতনারই এক অংশ। সুতরাং আমাদের মত হল এই যে চেতনাই সবচেয়ে আদি বস্তু। প্রথমে যাই থাকুক না কেন তারও আগে চেতনার অস্তিত্ব ছিল, তা না হলে কোনকিছু সম্বন্ধে কোন ধারণা ও বর্ণনা সম্ভব নয়। তাই বৈদিক তত্ত্ব বলেন যে ব্রহ্ম বা শ্রীভগবানের সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ নির্গুন নিরাকার তত্ত্বই জীবের আদি কারণ। আর জীবাত্মার উপরে আছেন পরমাত্মা। জড়জগতের সব সমৃদ্ধি হল তামসিক। কিন্তু এর বাইরে আছে এক উজ্জ্বল দিক, এক নিত্য জগৎ যেখানে চিরকাল শ্রীভগবানের কত আনন্দময় লীলা চলেছে — যেন এক সুখ ও আনন্দের সমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গের মত।

এইভাবে আমরা যেন বুঝি যে আমাদের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য কি, মানবজন্মের বিশেষ তাৎপর্য্য কি আর কিভাবে তার সদ্‌ব্যবহার করা যায়। এ জগতে কত রকমের ধর্ম্মীয় মতামত আছে। কিন্তু আমরা তো পরম সত্যের সন্ধানী, তাই সেইসব ধর্ম্মীয় মতের মধ্যে থেকে আমাদের এমন এক সিদ্ধান্ত খুঁজে নিতে হবে যা সবকিছুর সমন্বয় সাধন করতে পারে আর তাঁর জন্যে আমাদের এক তুলনামূলক অধ্যয়ন করতে হবে।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থান যেখানে সেই অবস্থার বা আশ্রমের যেন আমরা খুব সহজে পরিবর্ত্তন না করি। একটি উপমা দিয়ে বলা যেতে পারে যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি তাঁর সৈনিকদের বলেন, "নিজের জায়গাটা ছেড়ে দিও না। বরং নিজের জায়গাটা রাখবার জন্যে প্রাণ দিয়ে দাও।" কিন্তু যখন সুযোগ আসবে তখন সেই সেনাপতিই

বলবেন "এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও।" সেইরকম শাস্ত্র বলেছেন, "তোমার পূর্বকর্ম্ম অনুযায়ী যেখানে তোমার জন্ম হয়েছে, যে অবস্থায় তুমি বর্ত্তমানে আছ সেই অবস্থাটা ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা কোর না, তাহলে তোমার অধোগতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।" কিন্তু সেই একইসঙ্গে, যখন কোন যথার্থ সুযোগ আসবে তখন সেই শাস্ত্রই বলবেন, "এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও পরমসত্যের দিকে। প্রগতির পথে পা বাড়াও।" তাই ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে, "তোমার পূর্বকর্ম্ম অনুযায়ী যে অধিকার তুমি পেয়েছ, যে ধর্ম্ম তোমার হয়েছে, তাকে সহজে ছেড়ে দিও না, বরং তার জন্যে মৃত্যুকে বরণ করে নাও।" কিন্তু তারপর আবার কৃষ্ণ বলছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
(শ্রীমদভগবদ্ গীতা ১৮/৬৬)

অর্থাৎ "সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়ে একমাত্র আমারই শরণ নাও।" শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জ্জুনকে বলছেন যে "যখনই সুযোগ পাবে কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাওয়ার, তখনই যে কোন মূল্যে সেই সুযোগ তুমি অবশ্যই গ্রহণ করবে।" এ হল বিপ্লবী পন্থা। একদিকে আছে বৈধী পন্থা আর একদিকে বিপ্লবী পন্থা। বিপ্লবী পন্থা হল এই যে সমস্ত রকমের ঝুঁকি নিয়ে পরমসত্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে আর যেহেতু এই মানবজন্ম তারই সুবর্ণ সুযোগ দেয় তাই সেই সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করার জন্যে যা কিছু করা প্রয়োজন তাই করতে হবে। শুধু এই মানবজন্মেই আমাদের বিচারশক্তি ব্যবহার করার ও নিজের মতামতে চলার সুযোগ আছে। এই সুযোগ যদি আমরা ছেড়ে দিই আর তারপর পশুজন্ম বা বৃক্ষজন্ম পাই তবে কেউই বলতে পারে না যে কবে আবার আমরা এরকম স্বাধীন ও স্বেচ্ছাধীন মতে জীবন কাটাতে পারব। সেইজন্য এই মানবজীবন খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ, আর শুধু ইন্দ্রিয়তর্পনদ্বারা, শুধু আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন — এইরকম পশুপ্রবৃত্তির দ্বারা তার অপচয় করা উচিত নয়। যদি আমরা পশুজন্মও পাই বা যেখানেই আমরা যাই না কেন, পাখী বা কীটপতঙ্গ যাই হয়েই জন্মাই না কেন, এই ইন্দ্রিয়তর্পনের সুযোগ আমরা সবসময়ই পাব। কিন্তু আত্মাকে বিকশিত করার সুযোগ, আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন করার সুযোগ, জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন করার সুযোগ এই মানবদেহ

ছাড়া আর কোথাও পাব না। সাধুসঙ্গে এই সমস্ত তত্ত্ব বিশদভাবে আলোচনা করা যায়। এইভাবে আমরা নিজের জীবনে উন্নতি করতে পারি আর নিজেকে বাঁচাতে পারি। কিন্তু এই মানবজন্ম পেয়ে যদি আমরা এ সুযোগ হারাই তাহলে বুঝতে হবে যে আমরা আত্মহত্যা করলাম বা তার চেয়েও খারাপ কিছু করলাম। যে এই মানবজন্ম পেয়ে নিজেকে যথার্থভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করে না, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে চিরকালের জন্য উদ্ধার করে না, সে আত্মহত্যাই করে।

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী ঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সম্পাদিত)
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ (সম্পাদিত)
শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্
শ্রীপ্রেমধাম-দেব-স্তোত্রম
অমৃতবিদ্যা (বাংলা ও উড়িয়া)
শ্রীশিক্ষাষ্টক
সুবর্ণ সোপান
শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা
শাশ্বত সুখনিকেতন

The Search for Sri Krishna : Reality the Beautiful
(Eng. Spanish Hungari, Itali & Swedish)
Sri Guru and His Grace (English, Spanish, Russian, Bengali)
The Golden Volcano of Divine Love
Bhagavad Gita : The Hidden Treasure of The Sweet Absolute
Loving Search for the Lost Servant (Eng., Spanish)
Positive & Progressive Immortality
(Prapanna Jivanamritam)
Sermons of the Guardian of Devotion
(Vol. I. II. III. & IV)
Subjective Evolution
The Mahamantra,
Golden Stair Case,
Holy Engagement

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ থেকে প্রকাশিত ও প্রাপ্তব্য অন্যান্য গ্রন্থাবলী

শ্রীব্রহ্মসংহিতা
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
শ্রীগৌড়ীয় গীতাঞ্জলী
শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ
শ্রীনামতত্ত্ব নামাভাস ও নামাপরাধ বিচার
শ্রীনাম ভজন বিচার ও প্রণালী
শরণাগতি
কল্যাণকল্পতরু
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত
শ্রীচৈতন্যভাগবত
The Bhagavata

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীলভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের ও তাঁর সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী

Benedictine Tree of Divine
Aspiration
Divine Guidance
Divine Messege for the devotees
The Divine Servitor
Dignity of the Divine Servitor

Sri Chaitanya Saraswat Math

CENTRAL TEMPLE AND MISSION:
Sri Chaitanya Saraswat Math, Kolergani, P. O. Nabadwip, District Nadia, W. Bengal, PIN 741302, INDIA
Tel: 40086 & 40752

BRANCH MISSIONS of SRI CHAITANYA SARASWAT MATH:

India: Sir Chaitanya Saraswat Math, Gaur Batsahi, P. O. Puri, Orissa 752001. Tel: 06752-23413

India: Srila Sridhar Swami Seva Ashram, Dasbisa, P. O. Govardhan, Dist. Mathura, U. P. 281502 Tel: (0565) 85 2195

India: Sri Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha, Opposite Tank 3, 487 Dum Dum Park, Calcutta 700 055.
Tel: (33) 551 9175

U. S. A.: Sri Chaitanya Saraswat Sevashram, 2900 N. Rodeo Gulch Rd., Soquel, CA 95073. Tel: (408) 4624712

U. S. A.: Sri Chaitanya Saraswat Math, 883 Cooper Landing Road, Suite 207, Cherry Hill, NJ 08002. Tel: (609) 962 8888

U. S. A.: 10884 Andrews Drive, Allen Park, MI 48101.
Tel: (313) 928 0620

U. S. A.: Sri Chaitanya Saraswat Math, 330 N. E. 130th Street, Miami, Fl 33161. Tel: 305-8952029

U. S. A.: Sri Giridhari Ashram, P. O. Box 1238, Keaau, Hawaii, HI 96749. Tel: (808) 968 8896

U. S. A.: Sri Chaitanya Sridhar Govinda Mission, RR1 Box 450-D, Crater Road, Kula, Maui, Hi 96790. Tel: (808) 878 6821

Mexico: Sri Chaitanya Saraswat Ashram de Mexico, A. R., Calle 69-B # 537, por 58-B, Fracc. Sta. Isabel, Merida, Yucatan.

Mexico: Sir Chaitanya Saraswat Sridhar Mission, Reforma 864, Sector Hidalgo, Guadalajara, Jalisco. Tel: (36) 269613

Mexico: Sri Chaitanya Saraswat Krishnanushilana Sangha, Calle Jupiter # 1523, Col. Nueva Lindavista, Guadalupe, Nuevo Leon.

Mexico: Sri Chaitanya Saraswat Ashram de Mexico, A. R., SGAR/363/93, Constitucion 951-25, Tijuana, B. C.

Venezuela: Sri Rupanuga Sridhar Ashram, Calle Orinoco, Ramal 2, Quinta No. 16, Colinas de Bello Monte, Cairacas.
Tel: 752 5265 Fax: 563 9294

Ecuador: Srila Sridhar Swami Seva Ashram, Lotizacion Armenia, Autopista General Rumiñahui cien metros pasando la entrada a Conocoto, P. O. Box 17-01-576, Quito. Tel: 408439

Colombia: Carrera 11A No. 96-42, Apto 201, Bogota-8. Tel: 560793

Brazil: Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Asan. Rua Mario de Andrade 108, Caucaia Do Alto-Cotia, Sao Paulo - CEP 06720-000 Tel: (011) 721 1109

Brazil: Sri Sri Gaura Nitai Ashram, Av. Anzu Garibaldhi 6499, Barreirinha, Curitiba, Parana, CEP 82 220-000.

U.K.: Sri Chaitanya Saraswat Math, 15 Gladding Rd., Manor Park, London E 12 5 DD, Tel. & Fax: (081) 478 2283

Ireland: Sri Chaitanya Saraswat Math, 3, Abercorn Square, Inchicore, Dublin 8. Tel: 450 4945

Italy: Sri Chaitanya Sridhara Sangha, Via Dandolo 24, Int: 41/Scala B, 00153 Roma.

Netherlands: Sri Chaitanaya Sridhara Sangha Nieuw Westerdokstraat 122, 1013 AG Amsterdam Centrum. Tel: (020) 626 6945

Netherlands: Sri Chaitanya Saraswat Ashram Middachtenlacan 128,1333 XV Almere Buiten.

Czech Republic: Sir Chaitanya Saraswat Sangha, P. O. Box 44, 25263 Roztoky u Prahy.

Denmark: Sri chaitanya Saraswat Sangha, Olvenvej, 43, 6000 Kolding, Tel: 7550 3253

Germany: Sri Chaitanya Saraswat Ashram, Willibald-Alexis- Str. 20, 10965 , Berlin. Tel & Fax: 6919 320

Hungary: Pajzs utca 18. H --- 1025 Budapest. Tel: 361-2121917

Sweden: Lundbergsgatan 7b, 217 51 Malmo

Russia: 192238 St. Petersburg, Bela-kuna Street 12-24. Tel: (812) 268 04 45

Mauritius: Sri Chaitanya Saraswat Math, Ruisseau Rose Road, Long Mountain.

Mauritius: Sri Sri Nitai Gauranga Mandir, Near Social Welfare Centre, Valton road, Long Mountain.

South Africa: 57 Silver Rd., New Holmes, Northdale Pietermaritzburg, Natal 3201. Tel: 0331 912026

South Africa: P. O. Box 60183, Phoenix 4068, Natal. Tel: 4085001576

Australia: Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Mission,. Lot 15, Beltana Drive, Terranora, N. S. W. 2486. Tel: 75904371

New Zealand: c/o Frank Pinter, Postal Delivery Centre, Waimauku Aukland. Tel: 411 7022

Malaysia: Sri Chaitanya Saraswat Sadhu Sangham, 932 Taman Bernam, Tanjong Malim, Perak 35900. Tel: 05-496942

Malaysia: Sri Chaitanya Saraswat Sadhu Sangham, 7 Taman Thye Kim, Jalan Haji Mohamed Ali, 32000 Sitiawan, Perak. Tel: 05-6915 830

Philippines: Srila Sridhar Swami Seva Ashram, # 23 Ruby St., Casimiro Townhouse, Talon I, Las Pinas, Metro Manila.

শ্রীবৃন্দাবন ধামে শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের নতুন স্থানে
পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দদেব গোস্বামী মহারাজ ও ভক্তগণ

বর্ত্তমানে আমরা
বহির্জগতে আছি আর আমাদের
মনও বহির্মুখী হয়ে আছে। অসহায়ের
মত আমরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি।
শ্রীভগবানের প্রতিনিধিদের কৃপাই আমাদের একমাত্র
আশাভরসা। তাঁরা এসে পতিত আমাদের তুলে ধরেন
আর সাবধান করে দেন, "কি করছ তোমরা? এদিকে যেও
না, এ দেশ বিপদের দেশ, মৃত্যুর দেশ। এসো আমার সঙ্গে।
আমি তোমাকে অমৃতের দেশে নিয়ে যাবো।" ভগবানের এই
প্রতিনিধিরা আসেন আমাদের ঘুম থেকে তুলে দেওয়ার জন্যে,
আমাদের তামসিক উন্মত্ততার ঘোর কাটিয়ে দেওয়ার জন্যে। ....

তবে ধর্ম্মের নামে কত কিনা চলে, এ যেন একটা ব্যবসা। কিন্তু তার
মানে এই নয় যে প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি বলে কিছু নেই, প্রকৃত
মুক্তি বলে কিছু নেই। "হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো" — সেই হল চরম
প্রমাণ যখন নিজের হৃদয় থেকে সমর্থন আসবে যে "হ্যাঁ, এই
হল সেই সত্য বস্তু যা আমি চাই। আমার হৃদয়ের
অভ্যন্তর থেকে এর জন্য উল্লসিত সমর্থন আসছে।
আর আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করছে এই ভেবে
যে এমন উজ্জ্বল অমৃতময় সম্ভাবনা
আমার আছে।"

শাশ্বত সুখনিকেতন

মুদ্রক ঃ অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৮১ সিমলা স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৬